ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্

মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী : জীবন ও কর্ম

মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী
জীবন ও কর্ম

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী : জীবন ও কর্ম
ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

ইফাবা প্রকাশনা : ১৭২৩
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৯২২·৯৭
ISBN—984—06—0079—6

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ় ১৩৯৯
যিলহজ্ ১৪১২
জুন ১৯৯২

প্রকাশনায় :
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা—১০০০

প্রচ্ছদে :
রফিকুল ইসলাম

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে :
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা—১০০০

মূল্য : ৫৮·০০ টাকা মাত্র

MAULANA UBAIDULLAH SINDHI : JIBAN O KARMA (Maulana Ubaidullah Sindhi : Life and Works): written by Dr. Muhammad Abdullah in Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh. June 1992

Price . TK. 58 00
Dollar (US): 3·00

উৎসর্গ

জনাব এ. জেড্. এম. শামসুল আলম-কে
যাঁর অনুপ্রেরণায় আমি বইটি লিখেছি।

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্



মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে প্রায়শই একটা হীনমন্যতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্যবাসী তো বটেই এমনকি প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের মানুষেরা যে মুসলমানদের চেয়ে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-শিল্পে-সাহিত্যে-দর্শনে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এটা তাদের মন-মানস থেকে সহসা দূর হয় না। এ-কথা সত্য যে উনবিংশ শতাব্দীতে উপমহাদেশে হিন্দুদের মধ্যে যে জাগরণ ঘটেছিল বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে সেই জাগরণ সে সময় ঘটেনি। এর জন্যে রাজনৈতিক কারণ দায়ী। পলাশীর যুদ্ধ এবং সে যুদ্ধে বাঙালীর পরাজয় এবং তারই কারণে উপমহাদেশের মুসলমানদের পরাজয় ছিল মুসলিমের শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক জীবনে পশ্চাদপদতা। কিন্তু জগতের ইতিহাসে এবং সেই সঙ্গে উপমহাদেশের ইতিহাসে মুসলিমদের অপরিসীম অবদান অস্বীকার করার মত নয়। সে ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা কখনই মুসলিমদের জগতের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রের অবদানকে অনুল্লেখযোগ্য মনে করেন না; বরং গর্বযোগ্য মনে করেন।

জনাব মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থে সেই উজ্জ্বল ইতিহাসকে তুলে ধরার একটি মহৎ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর 'মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী : জীবন ও কর্ম' সেই দীপ্ত প্রয়াসের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

উপমহাদেশে বৃটিশের হাতে মুসলিমদের পরাজয়ের পর মুসলিমরা নিরুৎসাহিত হয়ে নিয়তির হাতে আত্মসমর্পণ করে বসে থাকেনি, তারা শুধু অস্ত্রের লড়াই নয়—শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি-প্রতিটি ক্ষেত্রে অদম্য সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ছিলেন এই বিপ্লবী সংগ্রামীদের অন্যতম অগ্রপথিক। ধর্মের সঙ্গে প্রগতিশীলতার মিশ্রণে দুনিয়া ও আখিরাতের চিন্তার সমন্বয়ে তিনি মুসলমানদের সামনে সত্যিকার ইসলামিক আদর্শভিত্তিক জীবনের দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে জনাব আবদুল্লাহ্ সেই মহাজীবনের স্বরূপ চমৎকার লেখার ভঙ্গিতে এবং পরিশ্রমী গবেষণা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি ইতিহাসের রূপকে সমৃদ্ধ করবে এবং মুসলমানদের নিজেদের ঐতিহ্যকে জানতে সাহায্য করবে বলে আমরা প্রকাশ করলাম। গ্রন্থটি সকল বাংলাদেশী ও বাংলাভাষী পাঠকের ইতিহাস-পাঠে অনুপ্রাণিত করুক—এই কামনা করি। আমীন!

মুখবন্ধ

বিগত কিছু দিনের মধ্যে উপমহাদেশের মুসলিম মনীষা সম্পর্কিত একাধিক সফল গবেষণা-কর্মের রচয়িতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্। তাঁর নতুন বইটি ঔপনিবেশিক ভারতের বিতর্কিত এবং বহুল উচ্চারিত মুসলিম চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক কর্মী মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী সংক্রান্ত। উল্লেখ্য, মওলানা সিন্ধীর জীবন ও কর্মের ওপর এটা-ই হলো প্রথম পূর্ণাংগ বই।

মওলানা সিন্ধী এই উপমহাদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্রান্তিকালে রাজনীতির অংগনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহোত্তর ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর নেতৃত্বে বৃটিশের প্রশাসন-নীতিতে যে পরিবর্তন সূচিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের মধ্যে আত্ম-সচেতনতার যে উন্মেষ ঘটে, তা পরিস্থিতির তাগিদে কয়েক দশকের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের প্রয়াসী একটি রাজনৈতিক কর্মসূচীতে পরিণত হয় এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এমনি ঘটনাবহুল পটভূমিতেই মওলানা সিন্ধীর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও তাঁর ধর্মাশ্রিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি ঘটে।

আমার মনে হয়, মওলানা সিন্ধীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগির মূলে কার্যকর ছিল তাঁর উপনিবেশ-বিরোধী চেতনা। ঔপনিবেশিক অচলায়তন অতিক্রম করার জন্য তিনি হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯২২ সালে কাবুলে কংগ্রেসের প্রথম আন্তর্জাতিক শাখা প্রতিষ্ঠায় তাঁর নেতৃত্ব ও বলিষ্ঠ ভূমিকা এ কথাই প্রমাণ করে। এই নিরিখেই তিনি ধর্মীয় আদর্শভিত্তিক পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। অবশ্য ঘটনা-প্রবাহে কংগ্রেস হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাই কংগ্রেসের ওপর মওলানা সিন্ধীর আস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

মওলানা সিন্ধীর জীবনাদর্শ ও রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে দু'টি পরস্পর-বিরোধী অভিমত সৃষ্টি হতে পারে। এর কারণ তাঁর নিজের কর্ম ও বক্তব্য। প্রথমত, কর্মজীবনের গোড়ার দিকে তিনি ধর্ম ও সমাজকে দুটো স্বতন্ত্র পরি-মণ্ডলরূপে বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কারণে ধর্ম ও সমাজকে সমন্বিত করতে চেয়েছেন। দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক পর্যায়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য সাংগঠনিক তৎপরতা প্রদর্শন করলেও জীবনের শেষ দিকে তাঁর সেই নীতি সক্রিয় রয় নি। উপরন্তু, জমিদারের উৎপীড়ন থেকে কৃষক সমাজকে রক্ষার জন্য তিনি সংসদীয় আইন রচনার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, সশস্ত্র বা প্রতিরোধক কিছু করার চিন্তা করেন নি। তবে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়, যখন তিনি যথেষ্ট প্রতীতি নিয়ে বলেছিলেন যে, ধর্মভিত্তিক বিভাজন নয়, বরং সর্বভারতীয় একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাই হবে পরবর্তী পর্যায়ে এই উপমহাদেশের একমাত্র রাজনৈতিক সমাধান। বিভিন্ন জাতি-সমস্যায় বিপর্যস্ত বর্তমান উপমহাদেশ সম্পর্কে মওলানা সিন্ধীর চিন্তাধারা তাঁর রাজ-নৈতিক দূরদর্শিতাই প্রমাণ করে।

সার্বিক প্রেক্ষাপটে মওলানা সিন্ধী-র কর্মকাণ্ড ও রাজনৈতিক দর্শন উপমহাদেশের সমাজ ও রাজনীতি-সচেতন গবেষক/পাঠকের জন্য নতুন চিন্তার পথ নির্দেশ করবে বলে মনে করি। প্রাপ্ত সব তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে মওলানা সিন্ধী-র ওপর এমনি একটি পূর্ণাংগ আলোচনা উপস্থাপনের জন্য অধ্যাপক আবদুল্লাহ্ ধন্যবাদার্হ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০ নভেম্বর ১৯৮৭

ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখকের কিছু কথা

মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ছিলেন সত্যানুসন্ধানী ও জাগ্রত বিবেকের অধিকারী। ন্যায়নিষ্ঠ বিবেকের তাড়নায় তিনি শিখ ধর্ম থেকে ইসলামে দীক্ষিত হন; মাতৃভূমি পাঞ্জাব ত্যাগ করে চিরতরে সিন্ধুর অধিবাসী হন। তাই তিনি 'সিন্ধী' নামে অভিহিত হন। যুগ যুগ ধরে কত অমুসলমান মুসলমান হয়ে আসছেন। কিন্তু ক'জন ধর্মান্তরিত মুসলমান ধর্ম ও রাজনীতি ক্ষেত্রে সিন্ধীর ন্যায় আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন?

ছাত্রজীবনে সিন্ধী দেওবন্দে মওলানা মাহমূদুল হাসানের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর ছোঁয়া পেয়ে তিনি জিহাদী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেন। এই মনোভাবই তাঁকে দেশছাড়া করে। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাবুল গমন করেন এবং উপমহাদেশ থেকে বৃটিশ শাসন উৎখাতের তদবীরে লেগে যান। শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেও তিনি হতোদ্যম হন নি। তিনি কাবুল ত্যাগ করে রাশিয়া ও তুরস্ক ভ্রমণ করেন এবং সেখানে কিছুকাল অবস্থান করে সেখানকার সমাজ-বিপ্লবের আলোকে স্বদেশে সমাজ-সংস্কার সাধন ও ইসলামী সমাজবাদ প্রবর্তনের নব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অতঃপর মক্কায় এক যুগ ধরে জ্ঞানসাধনা করেন, বিশেষত শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌র সমাজবিপ্লবের দর্শন গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন।

দেশে ফিরে সিন্ধী তাঁর উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেন; রাজনৈতিক দল গঠন করেন; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও একাডেমী স্থাপন করেন; গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা ক'রে এবং স্থানে স্থানে ভাষণ দিয়ে নিজ চিন্তাধারা প্রচার করেন। তিনি যতটুকু চেয়েছিলেন, ততটুকু না পেলেও তাঁর চিন্তা ও চেষ্টা নিষ্ফল হয় নি। ইকবালের ন্যায় তিনিও মুসলিম জাতির মধ্যে বিপুল সুপ্ত ক্ষমতা লক্ষ্য করেন এবং তা জাগ্রত করার জন্য তাদের উৎসাহিত করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি হলেন ভাষাভিত্তিক

জাতীয়তাবাদের উদগাতা। তাঁর সাহিত্যে বিধৃত ইসলামে ধর্ম ও জীবন একাকার হয়ে আছে। উপমহাদেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি কোথাও কোথাও ধর্মকে রাজনীতিতে অনাহূত টেনে আনতে চেয়েছিলেন।

কাবুলের নির্বাসিত জীবন নিয়ে লেখা তাঁর 'যাতী ডায়েরী' শীর্ষক পুস্তিকাটি এক অমূল্য ঐতিহাসিক দলীল। ১ম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে উপমহাদেশের বিপ্লবীরা এ দেশের মাটি থেকে বৃটিশ শাসন উৎখাতের উদ্দেশ্যে কাবুলে যেসব কর্মকাণ্ড করেছিলেন, সেগুলো জানার জন্য এ পুস্তিকাটির একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। সে সময়কার বিপ্লবী আন্দোলনে সিন্ধীর দুঃসাহসিক ভূমিকা আযাদীর ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। তাঁর বিপ্লবী কর্মতৎপরতার সাথে মওলানা মাহমুদুল হাসানের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড এবং বৃটিশের বিরুদ্ধে পরিচালিত উপমহাদেশীয় মুক্তিবাহিনীর জিহাদ-আন্দোলনের একটি অধ্যায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 'যাতী ডায়েরী' পাঠে আফগান-বাদশা আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান ও আমীর আমানুল্লাহ্ খানের সময়কার ইতিহাস সংক্রান্ত অনেক তথ্য জানা যায়। মওলানা সিন্ধী এতে আমীরদ্বয়ের সময়কার অনেক চাক্ষুষ ঘটনা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বর্ণনা করেছেন।

এ হেন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বাংলা ভাষায় কোন বই রচিত না হওয়ায় আমি এ যৎসামান্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। 'মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ঃ জীবন ও কর্ম' শীর্ষক এ বইটি পাঠক-পাঠিকার কিছুটা উপকারে আসলেও আমি আমার শ্রমকে সার্থক মনে করবো।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এই বইটির তথ্য সংগ্রহে আমাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছেন—আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। বন্ধুবর অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বইটির 'মুখবন্ধ' লিখে দিয়েছেন। তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১১ নভেম্বর ১৯৮৭

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
অধ্যাপক
উর্দু ও ফার্সী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচী

সংকেত-সূচী

খুতুবাত	খুতুবাত-এ-মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী মুহাম্মদ সরওয়ার (সম্পাদিত)
নক্‌শ-এ-হায়াত (২)	নক্‌শ-এ-হায়াত—খুদ্‌নাবিশ্‌ত্ সওয়ানিহ্ (২) সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী
রেশমী রূমাল	তাহ্‌রীক-এ-রেশমী রূমাল সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী
সরওয়ার মুহাম্মদ	মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী মুহাম্মদ সরওয়ার
সাঈদ	মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী আওর উন্‌-কে-নাকিদ সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী

অধ্যায় এক

কর্ম ও চিন্তা—এক নজরে

মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী (১৮৭২-১৯৪৪) ছিলেন প্রগতিবাদী শ্রেষ্ঠ আলিম, বিপ্লবী চেতনার অধিকারী রাজনৈতিক চিন্তানায়ক, বিশিষ্ট সংগঠক, উৎসর্গিত শিক্ষক, শাহ্ ওলী উল্লাহ্[১] (রহ.) রচনাবলীর বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার ও তাঁর চিন্তাধারার একনিষ্ঠ প্রচারক এবং সর্বোপরি ধর্মান্তরিত একজন ইসলাম-প্রাণ মর্‌দে মুমিন।

শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌র চিন্তাধারায় ঘটেছে সনাতনতা ও যুগধর্মিতার এক অপূর্ব সমাবেশ ও সমন্বয়। তিনি যুগে যুগে উদ্ভূত বিভিন্নমুখী ইসলামী চিন্তাধারার মধ্যে বিদ্যমান বিরোধসমূহ নিষ্পত্তি করার প্রয়াস পান। দেওবন্দের আলিমগণ ঐ পথের পথিক বলে নিজেরা দাবি করলেও বস্তুত তাঁরা ঐ ভাবধারা পুরোপুরি মেনে চলতে পারেন নি। তাঁরা শাহ্ সাহেবের সনাতনতা তথা আধ্যাত্মিকতা ও শরীঅততত্ত্বের দিকটাই আঁকড়ে ধরে রাখেন—তাঁর বাতলানো আর্থ-সামাজিক বিপ্লবের দিকটার প্রতি ধ্যান দেন নি। কিন্তু এই গতানুগতিকতা ও রক্ষণশীলতার মধ্যেও দেওবন্দ স্কুল তার গোটা ইতিহাসে একমাত্র ব্যক্তিত্বই সৃষ্টি করেছে, যিনি শাহ্ সাহেবের চিন্তার আত্মিক ও বৈষয়িক—উভয় দিক বাস্তবায়িত করার শিক্ষা দেন।[২] ঐ ব্যক্তিত্ব হলেন এই প্রবন্ধের প্রাণ মওলানা সিন্ধী। তিনি "রাব্বানা আতিনা ফিদ্-দুনিয়া হাসানাতাঁও-ওয়া-ফিল্-আখিরাতি হাসানাহ্" (হে খোদা দাও মংগল আমাদেরকে এ জীবনে এবং পরজীবনেও)—এই মর্মবাণীর রূপায়ণের পথ-নির্দেশ দেন। তিনি প্রথমে ছিলেন 'মৌলবী', পরে ছিলেন অন্য সব কিছু। তিনি জগত ও জীবন এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সবক দিলেও ইসলাম ও পরকালের কথা কখনো ভুলে যান নি।[৩] তিনি চেয়েছিলেন

দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে সৃষ্টি হোক একটা বাস্তব সেতুবন্ধন। তিনি কামনা করেছিলেন---শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে উপমহাদেশের জনগণ অর্থ-সামর্থ্যে ইউরোপের নাগরিকদের মত উন্নত হোক[৪], পুঁজিবাদীদের শোষণ ও শাসনের অবসান ঘটুক, সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত হোক,[৫] কৃষক, কারিগর ও শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা ইউরোপের এ সব শ্রেণীর সমতুল্য হোক।[৬]

সিন্ধী ছিলেন আযাদীর প্রতীক।[৭] শেষ জীবনে[৮] বৃটিশ প্রশাসনের প্রশংসা করলেও[৯] এবং ভারতে আরো কিছুকালের জন্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন (Dominion Status) চাইলেও[১০] প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ইংরেজ রাজত্বের ঘোর দুশমন। তিনি ছিলেন শায়খুল হিন্দ্ মওলানা মাহমূদুল হাসান[১১] গঠিত (১৯০৫-১৪) বিপ্লবী দলের একজন উৎসর্গিত দুঃসাহসিক কর্মী।[১২] ঐ দলের কর্মসূচী ছিল---তুর্কী সেনাবাহিনী কর্তৃক কাবুলের মধ্য দিয়ে বৃটিশ ভারত অবরুদ্ধ করা এবং একই সময়ে উপমহাদেশে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ঘটিয়ে বৃটিশ শাসন উৎখাত করা। ঐ অভিযান পরিচালনার জন্য উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতীয় স্বাধীন এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সামরিক সেক্টর নিরূপণের জন্য একটা নীলনকশা অংকনের প্রয়োজন ছিল। সিন্ধী শায়খ মুহম্মদ ইব্রাহীমের[১৩] সহযোগিতায় সাত বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ঐ নীলনকশা প্রস্তুত করেন।[১৪] তাঁর এই অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতার নিরিখে মাহমূদুল হাসান ১ম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে আফগানিস্তানে উপনীত ভারতীয় মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্বদান এবং সেখানে একটি অস্থায়ী ভারত সরকার গঠনের জন্য মওলানা সিন্ধীকে কাবুলে পাঠান (১৫ আগস্ট ১৯১৫) এবং স্বয়ং দূত মারফত ইতিপূর্বে সম্পাদিত 'বিপ্লবী তুর্কী চুক্তি' ও 'তুর্কী-আফগান চুক্তি'-কে দ্বিতীয় দফা পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে তুরস্কের উদ্দেশ্যে মক্কা যাত্রা করেন (সেপ্টেম্বর ১৯১৫)।[১৫]

সিন্ধী কাবুলে সাফল্যজনকভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সেখানে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ[১৬] ও অধ্যাপক বরকতুল্লাহ্‌র[১৭] সহায়তায় একটি অস্থায়ী আযাদ ভারত সরকার কায়েম করেন এবং 'জুনূদুল্লাহ্' (খোদাই লশকর) নামে কাবুলে উপনীত ভারতীয় মুজাহিদদের নিয়ে একটি সেনাবাহিনীও গঠন করেন।[১৮] কাবুলের তদানীন্তন বাদশা আমীর হাবীবুল্লাহ্

খানের[১৯] বিশ্বাসঘাতকতা ও গোয়েন্দাগিরির দরুন যদিও ভারতীয় বিপ্লবী দলের ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু মওলানা সিন্ধীর কাবুলে নিয়ে যাওয়া যুদ্ধের নীলনকশাটি আমীর আমানুল্লাহ্ খান[২০] ঘোষিত ৩য় ঈংগ-আফগান যুদ্ধে (১৯১৯) বিশেষ ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। তা ছাড়া মওলানা সিন্ধী ও তাঁর 'জুনূদুল্লাহ্'র রণচাতুর্যও ঐ যুদ্ধে আফগানদের বিজয় অর্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।[২১] তিনি ও তাঁর 'খোদাই লশকরের' অধিনায়কগণ বিভিন্ন সেকটরে যুদ্ধ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।[২২] ঐ যুদ্ধে আমীর আমানুল্লাহ্ খান-সরকার বৃটিশ ভারত আক্রমণ করে এবং কোহাট পর্যন্ত দখল করে। ফলে বৃটিশ সরকারের সাথে আফগান সরকারের সন্ধি হয়। যুদ্ধ, সন্ধি ও সরকার পরিচালনায় আমানুল্লাহ্ খান সব সময় সিন্ধীকে অস্থায়ী ভারত সরকারের প্রতিনিধি বলে' তাঁর সহকারীরূপে সাথে রাখতেন।[২৩ক] ঐ সন্ধিতে বৃটিশ সরকার আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে। আফগান সরকারও বৃটিশের অধিকৃত এলাকা ছেড়ে দেয়। ঐ সন্ধির ফলে আফগান সরকার স্বাধীনভাবে তাদের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের অধিকার লাভ করে। আফগানিস্তানের বিজয় ছিল সমগ্র মুসলিম জাতিরই বিজয়।

মওলানা সিন্ধী তাঁর প্রভাবশালী ভাবমূর্তি দিয়ে আফগান শাসনকর্তাদেরকে বৃটিশ ভারত বিরোধী যুদ্ধে প্রবৃত্ত করতে সক্ষম হন।[২৩খ] আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান গোপনে বৃটিশের পক্ষ ধারণ করলেও বাহ্যত তিনি বিপ্লবী দল এবং আফগান সামরিক ও বেসামরিক শাসনকর্তাদের চাপে তুর্কী বাহিনীকে তাঁর দেশের সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারত আক্রমণ করার সম্মতি দেন এবং স্বীয় নিরপেক্ষতার কথা ঘোষণা করেন।[২৪] সিন্ধী কাবুলে প্রবেশ করেই আমীর হাবীবুল্লাহর কনিষ্ঠ পুত্র সর্দার আমানুল্লাহ্কে বশ করেন। তাই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আমানুল্লাহ্ আফগানিস্তানের সকল ব্যাপারে সিন্ধীর পরামর্শের গুরুত্ব দিতেন। সিন্ধীর বিশ্বাস্য যুক্তিতেই তিনি ভারতের আযাদীর সমর্থক হন এবং ইংরেজ বিতাড়নে সক্রিয় হয়ে উঠেন।[২৫] সিন্ধীও আফগান সরকারের হিত সাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।[২৬] নিয়তির বিধান, তিনি মাতৃভূমির মুক্তির উদ্দেশ্যেই পরদেশে গেলেন, কিন্তু তা হলো না; তাঁর কর্মতৎপরতায় উপকৃত হলো ভিন একটি দেশ। তাঁর কাবুলের কার্যাবলী প্রমাণ করেছে তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা; তাঁর প্রতি আমীর আমানুল্লাহ্ খানের মত একজন বাদশার দৃষ্টিপাত ও

প্রশাসনিক কাজে বাদশা কর্তৃক তাঁর সহায়তা গ্রহণ তাঁর মহৎ ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তাকে আরো সুদৃঢ় করেছে।

উপমহাদেশের আযাদী সংগ্রামে সামরিক সাহায্য প্রাপ্তি, অন্তত ঐ ব্যাপারে নৈতিক সমর্থন লাভের জন্য কাবুলস্থ অস্থায়ী ভারত সরকার কর্তৃক রাশিয়া, জাপান ও তুরস্কে যে সব মিশন পাঠানো হয়, সেগুলোর গঠন-প্রণালী ও কর্মসূচী প্রণয়নে মওলানা সিন্ধী ভারত মন্ত্রীরূপে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন, যদিও মিশনের সদস্যদের দুর্বলতা ও আন্তর্জাতিক প্রতিকূল পরিস্থিতির দরুন সেগুলো অনেকাংশে সাফল্য অর্জন করতে পারে নি।[২৭] মওলানা সিন্ধী তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গোড়া থেকেই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়াসী ও কংগ্রেসভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি কাবুলে পদার্পণ করে আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান-সরকারের অনুমোদনক্রমে হিন্দুদের সাথে মিলেমিশে ভারতের স্বার্থে অস্থায়ী সরকারের কাজ করতে আরম্ভ করেন (১৯১৬)। তখন থেকেই তিনি নিজেকে কংগ্রেসী বলে দাবি করতেন।[২৮] হাবীবুল্লাহ্ খান-সরকারের অধীনে তিনি মাত্র ৬-৭ মাস স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পান। ১৯১৬ সালের আগস্টে মওলানা মাহমূদের নিকট প্রেরিত মওলানা সিন্ধীর 'রেশমী রুমাল পত্রের' রহস্য ফাঁস হওয়ার[২৯] পর বিপ্লব-পরিকল্পনার সাথে জড়িত লোকদের ধরপাকড় শুরু হয়।[৩০] বৃটিশ সরকারের নির্দেশে বিপ্লব-পরিকল্পনার সর্বাধিনায়ক মওলানা মাহমূদ মক্কার শেরিফ হুসাইন কর্তৃক গ্রেফতার হন[৩১] এবং ১৩৩৫ হিজরীর ১লা রমযান মোতাবিক ১৯১৭ সালের জুন মাসে মওলানা সিন্ধী আমীর হাবীবুল্লাহ্ কর্তৃক কাবুলে কারারুদ্ধ হন।[৩২] আনুমানিক এক বছর আট মাস সিন্ধী কাবুল ও জালালাবাদে নজরবন্দী ছিলেন। আমীর হাবীবুল্লাহর নিহত হওয়ার পর ১৯১৯ সালের ১লা মার্চ আমীর আমানুল্লাহ্ খান ক্ষমতাসীন হলে মওলানা সিন্ধী মুক্তি লাভ করেন।[৩৩] ১৯২২ সালের নভেম্বরে রাশিয়ায় যাত্রা করার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আনুমানিক পৌনে চার বছর তিনি আমীর আমানুল্লাহ্ খানের শাসনামলে সসম্মানে অতিবাহিত করেন। তিনি একদিকে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের কাজ করেন, অন্যদিকে আফগান সরকারেরও মংগল সাধন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপে আমীর আমানুল্লাহ্ খান কাবুলস্থ ভারতের অস্থায়ী সরকারের ক্রিয়াকর্ম বন্ধ করে দেন।[৩৪] সে সময় মওলানা সিন্ধী কাবুলে 'অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস'-এর একটি শাখা

গঠন করেন (১৯২২)। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে সেটাই ছিল কংগ্রেসের প্রথম শাখা। সিন্ধী ঐ কাবুল-শাখার প্রেসিডেন্ট ছিলেন।[৩৫]

সিন্ধী উপমহাদেশের তরুণদেরকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এত সচেতন ও এত সক্রিয় করে তোলেন যে, পরবর্তী খিলাফত আন্দোলনের সময় তাদের অগ্রণী ভূমিকার ফলে দেশের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে এবং স্বাধীনতা আন্দোলন অনেকটা ত্বরান্বিত হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সিন্ধী ভারতকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যেই কাবুল গিয়েছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্ন ধূলিসাৎ হওয়ায় তিনি আর দেশে ফেরেন নি এবং ফেরার মত পরিস্থিতি তথা অনুমতিও তাঁর ছিল না। তাই তিনি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং "উপমহাদেশের যুবকদের ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রেখে" সাত বছর (১৯১৫-১৯২২) পর কাবুল ত্যাগ করেন।[৩৬] তিনি মস্কোতে সাত মাস, আংকারায় তিন বছর ও মক্কায় প্রায় বার বছর অবস্থান করেন এবং ২৩/২৪ বছর নির্বাসিত জীবন যাপন করে বহির্দেশীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৯৩৯ সালের ৭ মার্চ ভারতের মাটিতে (করাচী) পদার্পণ করেন।[৩৭]

মওলানা সিন্ধী রাশিয়ার সমাজবাদ এবং নব্য তুরস্কের জাতীয়তাবাদ ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। তিনি দেশে ফিরে সমাজবাদ ও গণতন্ত্রের বাণী প্রচার করেন। তবে তাঁর এই সমাজবাদ হুবহু রাশিয়ার ধর্মবিবর্জিত সমাজবাদ ছিল না। তা ছিল ইসলামী সমাজবাদ।[৩৮] যদিও তিনি বলতেন, তাঁর সমাজবাদী চিন্তাধারার উৎস হলো শাহ ওলীউল্লাহ্‌র রচনাবলী ও তাঁর শিক্ষা দর্শন, কিন্তু এই উপমহাদেশে তিনি তা লাভ করতে পারেন নি। বস্তুত তিনি তাঁর স্বচক্ষে দেখা রাশিয়ার সমাজবাদের আলোকেই শাহ্ সাহেবের ভাবধারা অনুধাবনের প্রয়াস পান। রাশিয়ায় না গেলে সারা জীবন ঐ দর্শন পাঠ করেও হয়তো তাঁর পক্ষে সমাজবাদী হওয়া সম্ভবপর হতো না।

সিন্ধী যদিও দেশে ফেরার সময় বৃটিশবিরোধী রাজনীতি পরিহার করার মুচলেকা দিয়ে ভারতে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছিলেন, তথাপি তিনি রাজনীতি ত্যাগ করেন নি। তিনি কংগ্রেসের আওতায় উত্তর-পশ্চিম ভারতের জন্য সিন্ধুতে 'যমুনা-নর্মদা সিন্ধ্ সাগর পার্টি' নামক একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক দল গঠন করেন (ডিসেম্বর ১৯৩৯)।[৩৯] কিন্তু তাঁর এ দলটি

জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি।[৪০] তিনি তাঁর রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ভাবধারাকে দর্শনের আবরণে প্রচার করার প্রয়াস পান।[৪১] তিনি জীবনের গোড়াতে ছিলেন মুজাহিদ; কাবুলে গিয়ে হলেন ভারতীয় বিপ্লবী দলের তত্বাবধায়ক, 'খোদাই লশকর'-এর অধিনায়ক এবং অস্থায়ী ভারত সরকারের মন্ত্রী; রাশিয়ায় গিয়ে হলেন সমাজবাদের ভক্ত; তুরস্কে পৌঁছে হলেন কামাল পাশার জাতীয়াবাদ ও তাঁর রোমান অক্ষর প্রয়োগের মন্ত্রমুগ্ধ; সৌদী আরবে পদার্পণ করে সাজলেন জ্ঞানসাধক, শাহ ওলীউল্লাহ্‌র বিপ্লবী ও আর্থ-সামাজিক ভাবধারার পূজারী; দেশে ফিরে এলেন প্রধানত একজন বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকের বেশে। তিনি আজীবন সভা-সমিতিতে পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করেছেন।[৪২] বস্তুত তাঁর ঐ স্বাধীনতা ছিল অনেকটা সীমিত। বৃটিশ উপনিবেশে যতটুকু স্বাধীনতা সম্ভব, তিনি ততটুকু স্বাধীনতার কথাই শুনাতেন।[৪৩] তিনি বৃটিশ শাসন বজায় রেখে 'ডমিনিয়ন স্টেটাস'-এর প্রয়াসী ছিলেন। তিনি ইংরেজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় তহযীব-তমদ্দুন বরণের জন্য দেশবাসীকে উৎসাহিত করেন।[৪৪]

সিন্ধী পাকিস্তান আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিলেন।[৪৫] তিনি বিশ্বাস করতেন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ব্যতীত ভারতের আযাদী সম্ভব নয়। তিনি বলতেন, ভারত একটি বহু জাতি বিশিষ্ট উপমহাদেশ, যেখানে রয়েছে বহু দেশ ও বহু সম্প্রদায়। তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচী ছিল—ভারতে অভিন্ন ভাষা ও সমতুল্য তমদ্দুনের ভিত্তিতে স্টেটসমূহ সৃষ্টি করে সেগুলোকে একটি ফেডারেল সরকারের আওতাধীন রাখা।[৪৬] তাঁর বিশ্বাস ছিল, ভারতে ইউনিটারি সরকার গঠিত হলে তাতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হবে না; অভিন্ন ভাষা ও সমতুল্য তমদ্দুনের ভিত্তিতে প্রদেশগুলোকে বিভিন্ন স্টেটে রূপান্তরিত করা হলে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বও হ্রাস পাবে, পক্ষান্তরে আঞ্চলিকতার প্রবণতাও বিদূরিত হবে।[৪৭] তাঁর অভিমত ছিল—প্রত্যেকটি স্টেট গণতন্ত্রের নীতিতে পরিচালিত হবে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রত্যেক স্টেট থেকে ফেডারেল সরকারে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হবে। ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে শুধু দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি; বাকি সব ক্ষেত্রে স্টেটগুলো হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন।[৪৮]

সিন্ধীর রাজনৈতিক চিন্তাধারার মূল্য এখনো ফুরায় নি বলে মনে হয়। বর্তমানে ভারত ও পাকিস্তানে আঞ্চলিকতা, ভাষা ও তমদ্দুনের ভিত্তিতে

স্বাধীন স্টেট গঠনের যে সব আন্দোলন দেখা যায়, সিন্ধীর ভাবধারার আলোকে সেগুলোর যৌক্তিকতা বিচার করা যেতে পারে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সিন্ধী ছিলেন ইসলামী সমাজবাদে বিশ্বাসী। তিনি ভারত উপমহাদেশে শিল্প-বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন। তবে তা পুঁজিবাদীদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নয়, বরং তা ঘটাতে চেয়েছিলেন কৃষক-মজুরদের সার্বিক ও সামগ্রিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে। তিনি মনে করতেন, ইসলামে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদের কোন স্থান নেই। এই পুঁজিবাদ সমাজের জন্য ক্ষতিকর।[৪৯] দেওবন্দী উলামার মধ্যে একমাত্র তিনিই নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি মানুষের বৈষয়িক ব্যাপার তথা বেঁচে থাকার প্রশ্নটি তুলে ধরেন। তিনি পরদেশের ভাল ভাল বস্তু স্বদেশে আনতে চেয়েছিলেন। ন্যায়নীতি ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর চরম ও পরম লক্ষ্য।

সিন্ধী ছিলেন শাহ ওলীউল্লাহ্-দর্শনের বিশেষজ্ঞ। তিনি ছাত্রজীবন থেকে আমরণ সেই দর্শন চর্চা করেন। মক্কার বার বছরের শিক্ষা-সাধনায় তিনি প্রধানত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ ও তৎসংক্রান্ত ইসলামী সাহিত্য অনুধাবনের চেষ্টা করেন; তথায় তিনি এ সব পড়েছেন এবং পড়িয়েছেন। তাঁর ভাষ্যানুসারে, শাহ্ ওলীউল্লাহ্র দর্শনের মধ্যেই তিনি মানবতাবাদ, সমাজবাদ ও ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লবের উৎস খুঁজে পেয়েছেন।[৫০] সেজন্যই তিনি দেশে এসে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলকে শাহ ওলীউল্লাহ-দর্শন চর্চার জন্য উৎসাহিত করেন। এ দর্শন চর্চার জন্য তিনি দিল্লীর জামিয়া-এ-মিল্লিয়ায় 'বায়তুল হিকমত্' প্রতিষ্ঠা করেন (নভেম্বর ১৯৪০)। তিনি লাহোর ও সিন্ধু-হায়দারাবাদে 'সিন্ধ্ সাগর একাডেমী' এবং সিন্ধুতে 'মুহাম্মদ কাসেম-ওলীউল্লাহ্ থিয়লজিক্যাল কলেজ' স্থাপন করেন। উর্দু ভাষায় শাহ সাহেবের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা সম্পর্কে তিনি 'শাহ ওলীউল্লাহ্ আওর উন্‌কী সিয়াসী তাহ্রীক' (লাহোর ১৯৪০) নামক একটি গবেষণা গ্রন্থ এবং তাঁর দর্শন সম্পর্কে 'শাহ্ ওলীউল্লাহ্ আওর উন্‌কা ফাল্‌সাফা' (লাহোর ১৯৪৪) শীর্ষক অপর একটি মৌলিক বই রচনা করেন।

লক্ষণীয় হলো-মওলানা সিন্ধী চিন্তাজগতে তৎকালীন সাধারণ আলিমদের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে তাঁদেরকে প্রগতিবাদের গণ্ডিতে আনার চেষ্টা করেছেন; ধর্ম ও জীবনকে তিনি একাকার করে দেখেছেন; ইউরোপীয় আধুনিক সভ্যতা ও শিল্প-বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছেন; কিন্তু আধুনিকতার বাস্তবায়ন

এবং শিল্প-বিপ্লব সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক যে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল, সে দিকে তিনি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি; আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন নি। তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে গতানুগতিক পদ্ধতির শিক্ষা প্রদান করেন। তিনি শাহ ওলীউল্লাহ্র ইসলামী সাহিত্য চর্চার মধ্যে নিজেও ডুবে রইলেন, অপরাপরকেও তাতে ডুবিয়ে রাখতে চাইলেন। এর পাশাপাশি তিনি যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন, তবে তাঁর চিন্তাধারা বাস্তব রূপ ধারণের পথ খুঁজে পেতো। তাঁর কর্ম তাঁর চিন্তার সাথে সমতালে চলে নি। তাঁর বড় কৃতিত্ব হলো—তিনি উপমহাদেশের আযাদী অর্জনের জন্য সক্রিয় ও দুঃসাহসিক প্রক্রিয়া অবলম্বনের পথ প্রদর্শন করেছেন। বৃটিশের সাথে তাঁর সম্মুখ যুদ্ধের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ হতে দেখে পরবর্তী সংগ্রামীরা বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাসবাদের পথ খুঁজে নিয়েছে। সিন্ধী ছিলেন সুভাষ বসুর (১৮৯৭-১৯৪৫) পূর্বসুরী। সিন্ধী যেমন ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় গোপনে দেশ ত্যাগ করেন এবং স্বাধীনতাকামী কাবুলস্থ মুজাহিদদের নিয়ে 'জুনূদুল্লাহ্' গঠন করে তুরস্কের সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দেশকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তেমনি সুভাষ বসুও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-৪৫) গোপনে দেশ ত্যাগ করে বার্লিন হয়ে টোকিও পৌঁছেন এবং জাপানস্থ ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে 'আযাদ হিন্দ্ ফৌজ' প্রতিষ্ঠা করে জাপানের যুদ্ধাভিযানের মাধ্যমে মাতৃভূমি থেকে বৃটিশ উৎখাতের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সিন্ধীর নাম অমর হয়ে থাকবে। সামাজিক ন্যায়নীতি ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তিনি যে চিন্তা-ভাবনা করেছেন, তা তাঁর প্রগতিবাদের স্বাক্ষর বহন করে। তিনি বিশেষ করে উপমহাদেশের আলিম সম্প্রদায়কে আধুনিকতা বরণ, সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনের যে সবক দিয়ে গেলেন, তা যুগে যুগে দিকদর্শন ও কর্মপ্রেরণার আধার হয়ে থাকবে।

তথ্য নির্দেশ

১. শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (১৭০৩-১৭৬২): বিশ্ববিখ্যাত প্রতিভাবান ইসলামী চিন্তাবিদ, শেষ যুগীয় সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম, মুজতাহিদ, দার্শনিক, মহান গ্রন্থকার ও সমাজ সংস্কারক। উপমহাদেশে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা বিস্তারে এই শাহ্ পরিবারের বিশেষ অবদান রয়েছে। শাহ্ সাহেবের জন্ম হয় দিল্লীতে। তিনি ছিলেন শাহ্ আবদুর রহীমের পুত্র। পনর বছর বয়সে তিনি পিতার নিকট হাদীস, তফসীর, ফিক্হ্ ও দর্শনের শিক্ষা সমাপ্ত করে শিক্ষাদানের অনুমতি প্রাপ্ত হন। সতর বছর বয়সে তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান ক্ষেত্রে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। পিতার মৃত্যুর (১৭১৯) পর তিনি পিতা প্রতিষ্ঠিত রহীমিয়া মাদ্রাসায় একটানা বার বছর শিক্ষকতা করেন। ১৭৩০ সালে তিনি মক্কা-মদীনায় গমন করে তথাকার হাদীসবিদদের নিকট হাদীসের উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। নজদের মুহম্মদ বিন্ আবদুল ওয়াহ্হাব ছিলেন তাঁর সমসাময়িক। তাঁরা উভয়েই হেজাযের জনৈক খ্যাতিমান শিক্ষকের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন। সংস্কারক ইবনে ওয়াহ্হাবের সাহচর্যের ফলে শাহ্ সাহেবের মধ্যেও সমাজ সংস্কারের প্রেরণা জাগে। ১৭৩২ সালের ৯ জুলাই তিনি দেশে ফিরে পুনরায় রহীমিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। আমরণ শিক্ষাদান করে তিনি ১৭৬২ সালে ইন্তিকাল করেন এবং দিল্লীতে সমাহিত হন।

শাহ্ সাহেবের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক চিন্তাধারা মুসলিম জাহানে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এতে মুসলমান জাতি শরীঅত ও তরীকতের পাশাপাশি জগত ও জীবন তথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার চেতনা লাভ করে। শাহ্ সাহেব বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায় ও বিভিন্ন মাযহাবের ইমামদের মতবাদসমূহের মধ্যে বিরাজমান বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। তিনি মুজতাহিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সকল সম্প্রদায় ও মাযহাবের উর্ধ্বে উঠে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করেন। শরীঅতের যাবতীয় বিধানের পেছনে নিহিত দর্শন সংবলিত তাঁর গ্রন্থ-'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগা' মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে এক অমূল্য সংযোজন। এতে মানব সমাজের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। 'ইযালাতুল্ খিফা' নামক গ্রন্থে তিনি খিলাফত-এ-রাশিদাকে ইসলামের মূলনীতির উৎস বলে বর্ণনা করেন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। তাঁর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো: আল্-ফওযুল্ কবীর, ফাত্হুর রহমান, মুসাফ্ফা, মুসওওয়া, তাজ্রীদুল্ বুখারী, তাবীলুল্ আহাদীস, ইক্দুল্ জীদ, আক্ওয়ালুল্ জামীল, লাম্আত, আল্-বুদূরুল বাযিগাহ্।

(মুহম্মদ ইসহাক ভাট্টী, ফুকাহা-এ-হিন্দ (৫ম খণ্ড, ২য় ভাগ), লাহোর, ১৯৮১, পৃঃ ৩১৭-৪০৫; নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা ১৯৬৬, পৃঃ ২০০-২০২; এস. এম. ইকরাম, মওজ-এ-কওসর, লাহোর, ১৯৬৮, পৃঃ ৩৪৫-৪৬)।

২. ইকরাম, এস. এম. মওজ-এ-কওসর, ফীরোয সন্স, লাহোর, ১৯৬৮, পৃঃ ৩৪৫-৪৬

৩. ঐ ৩৬৫-৬৬
৪. খুতুবাত ৪৯, ১৩৩
৫. ঐ ২০২-২০৩
৬. ঐ ১৮১
৭. ঐ ১১৮
৮. ঐ ১৩৯, ১৭২, ২০৪
৯. ঐ ১০৯-১১০
১০. ঐ ১৩৯, ১৭২, ২০৫
১১. মাহমুদুল হাসান, শায়খুল্ হিন্দ (১৮৫১-১৯২০)ঃ বিশিষ্ট ধর্মবেত্তা, জাতীয়তাবাদী তথা কংগ্রেসী রাজনীতিক ও ভারতীয় বিপ্লবী দলের সর্বাধিনায়ক। জন্ম ঃ বেরিলী ; শিক্ষা ঃ দারুল উলুম, দেওবন্দ-১৮৬৭-৭৩ ; সহকারী শিক্ষক ঃ ঐ -১৮৭৫-৮৭ ; প্রধান শিক্ষক ঃ ঐ-১৮৮৮-১৯২০। তাঁর পরিচালনায় মাদ্রাসাটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে, এর প্রতি অন্যান্য মুসলিম দেশের শিক্ষার্থীদেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৯০৯ সালে তিনি তাঁর যথাযোগ্য ও বিশ্বস্ত শাগরিদ উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকে সেক্রেটারি করে দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে একটি সমিতি- 'জমীঅতুল্ আনসার' গঠন করেন এবং এর মাধ্য.ম দেওবন্দ মাদ্রাসা ও আলীগড় কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈরী ভাব দূর করে সুহৃদসুলভ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস পান। কিন্তু প্রত্যাশিত সৌহার্দ্য স্থাপিত হয় নি। ১৯১৩ সালে ডঃ আনসারী, হাকীম আজমল খাঁ ও নওয়াব ওকারুল মুল্‌কের সহযোগিতায় তিনি দিল্লীতে 'নিযারাতুল্ মাআরিফ' (কুরআন শিক্ষা একাডেমী) স্থাপন করেন এবং সিন্ধীকে এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। ভারতকে বৃটিশ শাসনের কবল থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লীতে সদর দফতর স্থাপন করে একটি বিপ্লবী দল গঠন করেন। প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে তিনি তুর্কী ও আফগান সরকারের সাথে এই ঐকমত্যে উপনীত হন যে, তুরস্ক-বাহিনী যথাসময় আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে বৃটিশ ভারত আক্রমণ করবে এবং একই সময় ভারতবাসীরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, বৃটিশ উৎখাতের পর তুর্কী বাহিনী বিপ্লবী সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে তুরস্কে ফিরে যাবে। ১৯১৪ সালে ১ম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে বিপ্লবী দলের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি দেওবন্দে মাহমুদুল হাসানের বাসভবনে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ১৯১৭ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি পরিকল্পিত বিপ্লব ঘটাতে হবে। কমিটি ঐ মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে তা মওলানা মাহমুদের হাতে দেন এবং ইতিপূর্বে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে তুর্কী ও আফগান সরকারদ্বয়ের সাথে যে চুক্তি হয়েছিল, তা মুখোমুখি আলাপ করে অনুমোদিত করিয়ে নেয়ার ভারও তাঁর উপর ন্যস্ত করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি মওলানা সিন্ধীকে কাবুলে পাঠান (আগস্ট ১৯১৫) এবং স্বয়ং সে বছর ১৮ সেপ্টেম্বর তুরস্কের উদ্দেশ্যে বোম্বে থেকে যাত্রা করে অক্টোবরে মক্কায় উপনীত হন এবং কিছু দিন পর মদীনায় আগত তুর্কী যুদ্ধমন্ত্রী আনওয়ার পাশার সংগে দেখা করে বিপ্লবী দলের ঐ চুক্তির অনুমোদন করিয়ে নেন, ; তা ছাড়া তিনি

আফগান সরকার ও তুর্কী সরকারের মধ্যে সম্পাদিতব্য চুক্তিতেও তখন স্বাক্ষর করিয়ে নেন। বিপ্লবের তারিখ পূর্ববৎ ১৯১৭ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি বহাল রাখা হয়। কর্মসূচী ছিল-'তুর্কী-আফগান' চুক্তিটি মওলানা মাহমুদ স্বয়ং কাবুলে নিয়ে যাবেন। কিন্তু যুদ্ধের কারণে পথঘাট নিরাপদ না থাকায় তিনি স্বয়ং না গিয়ে মওলানা হাদী-হাসান খান জাহানপুরীর মারফত তা কাবুলে অবস্থানরত মওলানা সিন্ধীর নিকট পেঁাছে দেন। মওলানা সিন্ধী তদানীন্তন কাবুলের বাদশা আমীর হাবীবুল্লাহ্‌র নিকট থেকে ঐ চুক্তিপত্রের মোটামুটি অনুমোদন নিয়ে বিষয়টি একটি গোপন 'রেশমী রুমাল-পত্রে' লোক মারফত মওলানা মাহমুদকে মক্কায় জানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন (জুলাই ১৯১৬); বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগ সিন্ধুতে শায়খ আবদুর রহীমের নিকট থেকে ঐ পত্র উদ্ধার করে (আগস্ট ১৯১৬)। তখন হেজাযে ইংরেজের পক্ষপাতী শেরিফ হুসাইন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন (জুন ১৯১৬)। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে তিনি বিপ্লবী দলের নেতা মওলানা মাহমুদকে গ্রেফতার করে ইংরেজদের হাতে সোপর্দ করেন। ১৯১৭ সালের ১২ জানুয়ারি তাঁকে মিসরে পাঠানো হয় এবং তথায় সামরিক আদালতে তাঁর বিচার করা হয়। বিচারে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু না পেয়ে তাঁকে মাল্টায় দ্বীপান্তরিত করা হয়। ১৯১৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তাঁকে মিসর থেকে মাল্টায় পাঠানো হয় এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি তিনি মাল্টায় উপনীত হন। তিন বছর সাত মাস নির্বাসনের পর যুদ্ধশেষে তিনি ১৯২০ সালের ১২ এপ্রিল মুক্তি লাভ করেন। ১৯২০ সালের ২৯শে অক্‌টোবর তিনি আলীগড়ে মওলানা মুহম্মদ আলী প্রতিষ্ঠিত 'জামিয়া-এ-মিল্লিয়া'র উদ্বোধন করেন। ১৯২০ সালের ৩০শে নভেম্বর তিনি দিল্লীতে ডঃ আনসারীর বাস-ভবনে ইন্তিকাল করেন এবং দেওবন্দে সমাহিত হন।

১২. রেশমী রুমাল ১৪৭-৪৮

১৩. শায়খ মুহাম্মদ ইব্রাহীমঃ বোম্বের অধিবাসী নওজোয়ান ইব্রাহীম ইংরেজীতে বি.এ. অনার্স এবং অর্থনীতিতে এম. এ. ছিলেন। পরবর্তী সময় তিনি কাবুলে বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। তিনি সিন্ধীর পূর্বেই কাবুলে গিয়ে হাবীবিয়া স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরবর্তী সময় তাঁকে গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়। রাশিয়ার পথে আফগানিস্তানের এক গ্রামে তিনি মারা যান।

১৪. রেশমী রুমাল ১৪৭-৪৮

১৫. ঐ ১৮০-৮১

১৬. মহেন্দ্র প্রতাপঃ তিনি ছিলেন উচ্চ হিন্দু পরিবারের লোক। ১৯১৪ সালের শেষের দিকে তিনি ইটালি, সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স ভ্রমণ করেন। তিনি জেনেভায় গমন করে বিপ্লবী ভারতীয় রাজনীতিক হরদয়ালের সাথে পরিচিত হন। হরদয়াল তাঁকে জার্মান কনসালের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। অতঃপর তাঁরা উভয়ই বার্লিনে পেঁৗছেন। হরদয়াল, মহেন্দ্র প্রতাপ ও বরকতুল্লাহ্‌কে ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠনের জন্য কাবুলে পাঠান এবং স্বয়ং তিনি বার্লিন থেকে কাবুলের অস্থায়ী সরকারের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব নেন। মহেন্দ্র প্রতাপ অস্থায়ী ভারত সরকারের প্রেসি-ডেন্ট নিযুক্ত হন। (Rowlatt Report, Chapter XIV, P. 126)

১৭. বরকতুল্লাহ্, অধ্যাপক : তিনি ছিলেন ভূপাল স্টেটের অধিবাসী। তিনি ইংলণ্ড আমেরিকা ও জাপান ভ্রমণ করেন। তিনি টোকিওতে হিন্দুস্তানী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। সেখানে তিনি "The Islamic Fraternity" নামক একটি বৃটিশ বিরোধী পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। পত্রিকাটি জাপান সরকার কর্তৃক বন্ধ করে দেয়া হয় এবং তাঁকে অধ্যাপনার চাকরি থেকেও বরখাস্ত করা হয়। এর পর তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দেশ্যে গঠিত আমেরিকার 'গদর পার্টি'তে (বিদ্রোহী দল) যোগ দেন। ১ম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব থেকেই উপমহাদেশের বাইরে নানা দেশে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চলছিল। ঐ যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে যে সব মুক্তিসংগ্রামী ভারতবাসী জার্মানী ও অন্যান্য স্থানে ছিলেন, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সুযোগে তাঁরা সকলে বার্লিনে সমবেত হন এবং ভারত থেকে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য ইংরেজ বিরোধী জার্মান সরকারের সাথে গোপন আঁতাতে লিপ্ত হন। তুর্কী সরকারও ঐ পরিকল্পনায় যোগ দেন। মৌলবী বরকতুল্লাহ্ ঐ সময় আমেরিকা থেকে বার্লিনে পেঁৗছেন এবং হরদয়ালের নির্দেশে সেখান থেকে কাবুলে এসে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর সংগে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন করেন এবং ঐ সরকারের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

(Rowlatt Report 1918, Chapter XIV, P. 126)

১৮. রেশমী রুমাল ২০৫

১৯. হাবীবুল্লাহ্ খান, আমীর (১৮৭২-১৯১৯) : আমীর আবদুর রহমান খানের পুত্র। ১৯০১ সনের ১লা অক্টোবর থেকে তিনি ১৯১৯ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে জালালাবাদের নিকটস্থ লাগমান জেলার গোশ নামক কেল্লায় আততায়ীর গুলীতে নিহত হওয়া পর্যন্ত আফগানিস্তানের শাসনকর্তা ছিলেন। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তিনি বৃটিশপ্রীতি অবলম্বন করেন। এক চুক্তির মাধ্যমে তিনি আফগানিস্তানের কয়েকটি এলাকা বৃটিশ গভর্নমেন্টকে ছেড়ে দেন। পিতা-সম্পাদিত অপর এক চুক্তি অনুমোদন করে তিনি বৃটিশ সরকার থেকে এক লক্ষ ষাট হাজার পাউণ্ড গ্রহণ করেন এবং বিনিময়ে নিজ দেশের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষমতাটি বৃটিশ গভর্নমেন্টের হাতে অর্পণ করেন (১৯০৫)। তিনি বৃটিশ সরকার কর্তৃক 'হিযু ম্যাজেস্টি' (His Majesty) ব্যবহারের অনুমতি লাভ করেন (১৯০৫)।

১ম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময় আমীর হাবীবুল্লাহ্ ১৯১৪ সালের ২৪শে আগস্টের এক ফরমানে যুদ্ধের ব্যাপারে আফগানিস্তানের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করেন। ফলে তাঁর পক্ষে 'তুর্কী-জার্মান মিশন' কে ন্যায্য বলে গ্রহণ এবং কাবুলে একটি অস্থায়ী ভারতীয় বিপ্লবী সরকার গঠনে অনুমতি প্রদান সম্ভব হয়। ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় আফগান শাসন কর্তৃপক্ষের শক্তিশালী দলটি তুরস্কের সমতালে বৃটিশ ভারত আক্রমণ করার জন্য তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করে। তিনি নিরপেক্ষ থাকেন। বলা হয়, তিনি কাবুলস্থ বিপ্লবী ভারত সরকারের গোপন তথ্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে ফাঁস করেছিলেন; তদুপরি দেশের ঐকান্তিক আগ্রহ সত্ত্বেও তিনি বৃটিশ ভারত আক্রমণ

করতে রাজী হন নি এবং সেই অজুহাতেই আমীর আমানুল্লাহ্ সমর্থিত শাসকচক্র কর্তৃক তিনি নিহত হন।

আমীর হাবীবুল্লাহ্ দেশ ও শাসনব্যবস্থাকে আধুনিকায়িত করার চেষ্টা করেন। তাঁর সময় দেশে মোটামুটি শান্তি বিরাজমান ছিল। এ সময় শিক্ষা ক্ষেত্রেও কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়।

আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান নিহত হওয়ার পর তাঁর ভাই নসরুল্লাহ্ খান জালালাবাদে নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু হাবীবুল্লাহ্ খানের কনিষ্ঠ পুত্র আমানুল্লাহ্ খান সামরিক জান্তার সহায়তায় নসরুল্লাহ্‌কে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। নসরুল্লাহ্ খান জেলে মারা যান। (Encyclopedia of Islam (III), London, 1936, P. 13; দায়েরা-এ-মাআরিফ-এ-ইসলামিয়া (৯), লাহোর ১৯৭২, পৃঃ ৮১৮৬; বাংলা বিশ্বকোষ (৪), ঢাকা, ১৯৭৬, পৃঃ ৭৬৫; Afghanistan (1900-1923) by Ludwig W. Adamec, California, 1967, Pp. 83-107)

২০. আমানুল্লাহ্ খান, আমীর (১৮৯২-১৯৬০)ঃ ১৯১৯ সনের ১লা মার্চ তিনি আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে বৃটিশ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন (মে-জুন ১৯১৯)। বৃটিশ যদিও পূর্বাঞ্চলে আফগানিস্তানের কিছুটা অংশ দখল করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আফগান জনগণের প্রবল যুদ্ধের মুখে, বিশেষ করে আফগান সেনাপতি জেনারেল মুহম্মদ নাদির খানের দৃঢ় পদক্ষেপে বৃটিশ শক্তি পরাভূত হয় এবং ১৯১৯ সালের ৮ আগস্ট রাওয়ালপিণ্ডিতে সম্পাদিত এক সন্ধি আনুযায়ী বৃটিশ গভর্নমেন্ট আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন। সোভিয়েট রাশিয়া ইতিপূর্বেই ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমীর আমানুল্লাহ্ এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দূতাবাস কায়েম করে স্বাধীন বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করেন। বৃটিশ গভর্নমেন্টকেও আফগানিস্তানে দূত নিযুক্ত করতে হয়।

আমানুল্লাহ্ খানের এই অবদান সত্ত্বেও আফগানিস্তানের আধুনিকীকরণে তাঁর অতি-উৎসাহ দেশে প্রবল ক্ষোভ সৃষ্টি করে। তিনি রাস্তাঘাট, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু দেশের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অর্থ-নৈতিক সমস্যা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। বিভিন্ন সরকারী পদে বিদেশী লোক নিয়োগ আফগানরা সুনজরে দেখে নি। তিনি স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন করলে (১৯২৪) তাঁর বিরুদ্ধে খোশ্‌ত এলাকায় বিদ্রোহ ঘটে। তিনি তা দমন করেন। ১৯২৮ সালে তিনি সস্ত্রীক ইউরোপ ভ্রমণ করেন এবং দেশে ফিরে আফগানদেরকে ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পরাবার এবং মেয়েদের পর্দাপ্রথা রহিত করার চেষ্টা করেন। তিনি একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ফলে সারা দেশে বিদ্রোহ ঘটে। ১৯২৯ সালের জানুয়ারিতে তিনি ভ্রাতা ইনায়েতুল্লাহ্‌কে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে ইটালি গমন করেন। বাচ্চা-ই-সাক্কা

নামক জনৈক দুঃসাহসী নিম্নস্তরের লোক ইনায়তুল্লাহ্‌কে অপসারণ করে সাময়িকভাবে সিংহাসন দখল করে। জনগণ কর্তৃক ঐ ব্যক্তি নিহত হলে প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি নাদির শাহ্ জনসমর্থনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। আমানুল্লাহ্ খান হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কয়েকবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালান। ১৯৬০ সালের ৩রা এপ্রিল তিনি ইটালিতে মারা যান। আফগানিস্তানের জালালাবাদে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

(বাংলা বিশ্বকোষ (১), ঢাকা, ১৯৭২, পৃঃ ১৯৪-৯৫; দায়েরা-এ-মাআরিফ-এ-ইসলামিয়া (২), লাহোর ১৯৬৬, পৃঃ ১০০২; Encyclopedia of Islam (III), London, 1936, P. 13; Ludwig W. Adamec, op.cit, Pp. 108-135; আনিস সিদ্দিকী, হতভাগ্য বাদশা আমানুল্লাহ্, খুলনা, তারিক সিদ্দিকী, ১৯৬৯)

২১-২২. নক্‌শ-এ-হায়াত (২), ১৭৯-৮০
২৩ক-খ. ঐ ১৭৯
২৪. রেশমী রূমাল ১৯১-১৯২
২৫. নকশ-এ- হায়াত, ১৭৬-১৭৯
২৬. ঐ ১৭৬
২৭. ঐ ১৭৯
২৮. খুতুবাত ৬৮-৬৯
২৯. রাওলাট রিপোর্ট, চতুর্দশ অধ্যায়, পৃঃ ১২৫
৩০. রেশমী রূমাল ১৯৮
৩১. ঐ ১৯৯
৩২. নকশ-এ-হায়াত, ১৭১
৩৩. ঐ, ১৭৫; রেশমী রূমাল ২২৪
৩৪. নকশ-এ- হায়াত ১৭৭
৩৫. খুতুবাত ৬৯
৩৬. নকশ-এ-হায়াত ১৭৬; রেশমী রূমাল ২২৪
৩৭. আজাদ, ৮ মার্চ, ১৯৩৯
৩৮. খুতুবাত ১১১, ১৪০
৩৯. ঐ ১৭৭
৪০. Naresh Kumer, Jain, Muslims in India (II), Manohar, 1983, P. 198
৪১. Ziaul Hasan, Faruqi, Deobond School and the Demand for Pakistan, Bombay, Asia Publishing House, 1963. P. 507
৪২. খুতুবাত ১৮১
৪৩. ঐ ১৩৯
৪৪. ঐ ১৮২

৪৫. ঐ ১৩১
৪৬. ঐ ১৮৩
৪৭. ঐ ১৬৪
৪৮. ঐ ১৪০
৪৯. ঐ ২০২
৫০. ঐ ২১২

অধ্যায় দুই

জীবন বৃত্তান্ত

জন্ম ও ইসলাম গ্রহণ

উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ১৮৭২ খৃস্টাব্দের ১০ মার্চ মোতাবিক ১২৮৯ হিজরীর ১০ মুহর্‌রম সিয়ালকোট জেলার (পাকিস্তান-পাঞ্জাব) মিঞাওয়ালী গ্রামে এক শিখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এটি ছিল মূলত একটি হিন্দু পরিবার। মওলানা সিন্ধীর নানার উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর (সিন্ধীর) পিতা রামসিং শিখ ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর (সিন্ধীর) পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম ছিল যথাক্রমে যশপত রায় ও গুলাব রায়। পিতামহ যশপত রায় পাঞ্জাবের শিখ শাসনামলে স্বগ্রামের মনসবদার ছিলেন। এই পরিবারের লোকেরা ছিলেন মণিকার। পরবর্তী সময় কিছু লোক চাকরি-বৃত্তি গ্রহণ করেন; কেউ কেউ সাউকারিও করেন।[১ক]

সিন্ধীর পিতা রামসিং তাঁর জন্মের চার মাস পূর্বেই মারা যান। এর দু'বছর পর দাদা যশপত রায়ও ইহধাম ত্যাগ করেন। তাই সিন্ধীর মা বাধ্য হয়ে তাঁকে তাঁর মাতুলালয়ে নিয়ে যান। সেখানে তিনি লালিত-পালিত হন। সেটা ছিল একটা গোঁড়া শিখ পরিবার। সিন্ধীর দুই মামা সিন্ধুনদের উপকূলস্থ ডেরাগাজীখান জেলার জামপুরে পাটওয়ারী ছিলেন। নানার মৃত্যুর পর সিন্ধী মামাদের কাছে চলে যান এবং ১৮৭৮ সালে ছয় বছর বয়সে সেখানকার উর্দু মডেল স্কুলে পড়াশোনা আরম্ভ করেন। ঐ স্কুলে থাকাকালে তিনি দু'বছর সিয়ালকোট জেলায় কাটান এবং পড়াশোনায় এক শ্রেণী পিছিয়ে পড়েন।[১খ]

১৮৮৪ সালে বার বছর বয়সে সিন্ধী নিজ স্কুলের এক আর্যসমাজপন্থী বালকের নিকট থেকে 'পণ্ডিত মৌলবী' বলে কথিত উবায়দুল্লাহ্ রচিত

'তুহ্ফাতুল হিন্দ্' ধার নিয়ে বারবার পাঠ করতে থাকেন। এই 'পণ্ডিত মৌলবী' ছিলেন মূলত অনন্ত রাম নামক একজন আর্যসমাজপন্থী হিন্দু। তিনি হিন্দু ধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। এতে তিনি ইসলামের 'তওহীদ' ও পুরাণের 'শির্‌ক্' জনিত ধর্মীয় বিশ্বাসের তুলনামূলক আলোচনা করেন এবং ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রয়াস পান। এই লোকটি শেষ পর্যন্ত ইসলামে দীক্ষিত হন। তাই তিনি মুসলমান সমাজে 'পণ্ডিত মৌলবী' বলে খ্যাত ছিলেন। পাঞ্জাবে তাঁর এই ধর্মসংস্কার-আন্দোলন খুবই প্রসার লাভ করে। ফলে শত শত হিন্দু যুবক ইসলামে দীক্ষিত হয়। 'তুহ্ফাতুল্ হিন্দ্' পাঠের ফলে সিন্ধীর মনে ধীরে ধীরে ইসলামের সত্যতা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। ঐ মডেল স্কুলের নিকটস্থ কোটলা মোগলান প্রাইমারি স্কুলের কিছু বন্ধুবান্ধবও তাঁর জুটলো। তারাও সিন্ধীর ন্যায় 'তুহ্ফাতুল হিন্দ্' পড়তে উৎসুক ছিল। তিনি তাদের নিকট থেকে শাহ্ ইসমাঈল শহীদ রচিত 'তাক্‌বিয়াতুল্ ঈমান' নিয়ে পাঠ করেন। এই গ্রন্থ পাঠে তাঁর নিকট ইসলামী তওহীদ ও পৌরাণিক শিরকের পার্থক্য ভালরূপে ধরা দেয়। এর পর তিনি এক পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেব থেকে ধার নিয়ে মৌলবী মুহাম্মদ লখনৌবী রচিত 'আহ্ওয়ালুল আখিরাত'ও পাঠ করেন। এই পড়াশোনার দরুন তাঁর মনের পরিবর্তন ঘটে। তিনি নামায শিক্ষা করেন এবং 'তুহ্ফাতুল হিন্দ্'-এর লেখকের নামানুসারে নিজের নাম স্থির করলেন 'উবায়দুল্লাহ্'।[২] ঐ সময় নামায পড়তে তাঁর কাছে কত ভাল লাগতো, সে কথা তাঁর ভাষায় বলতে গেলে "ঐ সময় আমি যখন ঘরে একাকী নামায পড়তাম, তখন আমার কাছে যে খুশীটা লাগতো, তা এত জ্ঞানলাভ ও এত কাল পর আজো মাঝে মাঝে অনুভূত হয়ে থাকে।"[৩]

১৮৮৭ ছসালের ১৫ আগস্ট সাড়ে পনর বছর বয়স্ক সিন্ধী ঐ মডেল স্কুলে ৮ম শ্রেণীতে থাকাকালে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের দায়ে নিজ বাসভূমি ত্যাগ করেন। তাঁর সাথে আবদুল কাদের নামক কোটলা মোগলানের এক বন্ধু ছিল। তাঁরা উভয়ে স্থানীয় আরবী মাদ্রাসার জনৈক ছাত্রসহ মোযাফ্‌ফর শাহ জেলার কোটলা রহমশাহে উপনীত হন। সেখানে ১৩০৪ সালের ৯ যুল্ হজ্ মুতাবিক ১৮৮৭ সালের সেপ্টেম্বরে মওলানা সিন্ধীর খতনা করানো হয়। এর কয়েক দিন পর তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁর পেছনে ধাওয়া করলে তিনি সিন্ধুর দিকে ছুটে যান। পথিমধ্যে তিনি ঐ আরবী ছাত্রটির নিকট আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা শুরু করেন।[৪]

সিন্ধুতে বসতি স্থাপন ও শিক্ষা গ্রহণ

মওলানা সিন্ধী সিন্ধুর ভরচণ্ডিওয়ালীর (শুক্কুর জেলা) তদানীন্তন বিখ্যাত মুর্শিদ হাফেয মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেবের নিকট গিয়ে তাঁর হাতে কাদেরী-রাশেদী তরীকায় বয়আত হন এবং তাঁর সাহচর্যে চার মাস থাকেন। এক দিন সিদ্দীক সাহেব উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে সিন্ধী সম্পর্কে বললেন: "উবায়দুল্লাহ্ আল্লাহ্‌র জন্যই মা-বাপ ত্যাগ করেছে; এখন আমিই তার মা-বাপ।[৫] তদবধি উবায়দুল্লাহ্ তাঁকে ধর্মীয় পিতা বলে মনে করতেন। এই ধর্মীয় পিতার দেশ-সিন্ধুকেই তিনি স্থায়ী বাসভূমি করে নেন। মুর্শিদের অনুমতি নিয়ে তিনি বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে আরবী মাদ্রাসার উক্ত তালিব -এ- ইল্‌মের সংগে ভাওয়াল এস্টেটের এক গ্রাম্য মসজিদে গিয়ে উঠেন এবং তথায় প্রাথমিক আরবী কিতাবসমূহ পড়েন। এর পর তিনি ভাওয়ালের দীনপুরে স্বীয় মুর্শিদ হাফেয মুহাম্মদ সিদ্দীকের প্রথম খলীফা মওলানা আবুস্ সিরাজ গুলাম মুহাম্মদের সাহচর্যে থেকে সেখানকার মওলানা আবদুল কাদেরের নিকট 'হিদায়াতুন্ নাহ্‌ব্' পর্যন্ত কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। খলীফা গুলাম মুহাম্মদ সাহেব পত্র লিখে সিন্ধীর মা-কে দীনপুরে ডেকে আনেন। মা তাঁকে জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। ১৩০৫ সালের শওওয়াল মুতাবিক ১৮৮৮ সালের জুন-জুলাই মাসে তিনি দীনপুর থেকে কোটলা রহমশাহে পৌঁছেন এবং মৌলবী খোদা বখশের নিকট 'কাফিয়া' পড়েন। এখানে তিনি নবাগত একজন ছাত্রের নিকট উত্তর ভারতের আরবী মাদ্রাসাসমূহের হাল-হকিকত জানতে পান এবং উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য মুযাফ্‌ফরগড় রেলস্টেশন থেকে ট্রেনে সরাসরি দেওবন্দে উপনীত হন।[৬]

দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসায়

১৩০৬ হিজরীর সফর মুতাবিক ১৮৮৮ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে সিন্ধী সাহেব দেওবন্দের দারুল উলূম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। আনুমানিক পাঁচ মাসে তিনি বিভিন্ন উস্তাদের নিকট 'কুত্‌বী' পর্যন্ত তর্কশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ শেখেন এবং আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থ-শরহে জামী' মওলানা হাকীম মুহাম্মদ হাসানের নিকট পড়েন। সেখানে তিনি অন্য একজন বিজ্ঞ উস্তাদের নিকট অধ্যয়ন-

পদ্ধতিও শিক্ষা করেন। তর্কশাস্ত্র ও দর্শনের গ্রন্থগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েক মাসের জন্য মওলানা আহমদ হাসানের নিকট কানপুর মাদ্রাসায় যান। অতঃপর কয়েক মাস রামপুর আলিয়া মাদ্রাসায় মৌলবী নাযেরুদ্দীনের নিকট অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। শেষোক্ত দুই জায়গায় শিক্ষা শেষ করে তিনি ১৩০৭ হিজরীর সফর মুতাবিক ১৮৮৯ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে দেওবন্দে ফিরে যান।[৭] এবার তিনি দেওবন্দে মওলানা হাফেয আহমদ ও প্রথম শিক্ষক সাইয়েদ আহমদের নিকট বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। শায়খুল হিন্দ মাহমূদুল হাসানের নিকট তিনি 'জামে' তিরমীযী' শিক্ষা করেন। মওলানা রশীদ আহমদের নিকট 'সুনান-এ-আবূ দাউদ' পড়ার জন্য তিনি দেওবন্দ থেকে গংগুহ গমন করেন।[৮]

চিকিৎসার জন্য দিল্লী গমন

গংগুহ্তে তিনি পীড়িত হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য তিনি দিল্লী যান এবং হাকীম মাহমূদ খানের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করেন। ওখানে অবস্থানকালে তিনি মৌলবী আবদুল করীম পাঞ্জাবীর নিকট হাদীসের বাকি গ্রন্থগুলো পড়েন। ঐ সময় দু'বার তিনি মওলানা সাইয়েদ নাযীর হুসাইনের হাদীস শিক্ষার আসরে যোগদান করেন।[৯]

সিন্ধু প্রত্যাবর্তন ও বিবাহবন্ধন

সোয়া দুই বছর দেওবন্দ ও দিল্লীতে শিক্ষা লাভের পর সিন্ধী ১৩০৮ হিজরীর ২০ জুমাদাস্ সানী মুতাবিক ১৮৯১ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লী থেকে সরাসরি ভরচণ্ডিতে ফিরে আসেন। প্রত্যাবর্তনের দশ দিন পূর্বে তাঁর মুর্শিদ হাফেয মুহাম্মদ সিদ্দীক ওফাতপ্রাপ্ত হন। সেই বছরের রজব মুতাবিক ফেব্রুয়ারি-মার্চে মওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দ থেকে সিন্ধীর নিকট হাদীস শিক্ষাদানের অনুমতি-পত্র প্রেরণ করেন। এই অনুমতির পর মৌলবী কামালুদ্দীন তাঁর নিকট ভরচণ্ডিতে হাদীস-গ্রন্থ 'সুনান-এ আবূ দাউদ' শিক্ষা করেন। ঐ বছরের শওওয়াল মুতাবিক জুন-জুলাইতে সিন্ধী তাঁর মুর্শিদের ২য় খলীফা মওলানা আবুল হাসান তাজ মাহমূদের নিকট ইমরোটে (শুক্কুর) গমন করেন। তিনি সিন্ধীর সাথে পিতৃসুলভ ব্যবহার করতেন। শুক্কুর ইসলামিয়া হাইস্কুলের শিক্ষক মৌলবী মুহাম্মদ আযীম

খান ইউসুফ যাইয়ের কন্যার সাথে তিনি সিন্ধীর বিয়ে করিয়ে দেন। সিন্ধীর মা-কেও তিনি ওখানে ডেকে নেন। মা বাকী জীবন সিন্ধীর সাথে কাটান এবং শিখ ধর্মেই অবিচল থাকেন। ওখানে সিন্ধী অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করে বড় একটি গ্রন্থাগার সৃষ্টি করেন এবং ১৩১৫ হিজরী মুতাবিক ১৮৯৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই খলীফার ছায়াতলে জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত ছিলেন।[১০]

ইমরোটে থাকাকালে সিন্ধী হায়দারাবাদ জেলার গোঠ পরীঝাণ্ডায় মাঝে মাঝে যাতায়াত করতেন। সেখানে তাঁর মুর্শিদের ৩য় খলীফা রাশেদী তরীকাপন্থী মওলানা রশীদুদ্দীনের বড় একটি ধর্মীয় গ্রন্থাগার ছিল। সিন্ধী সেখানে গিয়ে জ্ঞানসাধনা করতেন এবং গ্রন্থসমূহ ধার নিতেন। তিনি এই খলীফার "কারামত লক্ষ্য করেন" এবং তাঁর নিকট 'আসমা-এ-হুস্না' শিক্ষা করেন। এ ছাড়া ঐ সময় তিনি মুর্শিদের ৪র্থ খলীফা মওলানা আবুত্ তুরাব রাশেদুল্লাহ্র সাথে জ্ঞানমূলক আলোচনা করতেন। ইমরোটে থাকা-কালে সিন্ধী দীনপুর গিয়ে তাঁর মুর্শিদের প্রথম খলীফা আবুস্ সিরাজ গুলাম মুহাম্মদের নিকট আধ্যাত্মিক সবকও হাসিল করতেন।[১১]

১৮৯৭ সালে সিন্ধী স্বরচিত দু'টি পুস্তিকা নিয়ে পুনরায় কিছু দিনের জন্য দেওবন্দ গমন করেন। এ দু'টির মধ্যে একটি ছিল হাদীস বিষয়ক, অপরটি ফিক্হ্-এ-হানাফীমূলক। মওলানা মাহমূদ পুস্তিকা দু'টি পছন্দ করেন এবং তাঁর হাদীস শিক্ষাদানের অনুমতির পুনরাবৃত্তি করেন।[১২] জিহাদের আলোচনা প্রসংগে সিন্ধী মওলানা মাহমূদের নিকট তাঁর জিহাদ বাহিনী গঠনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি তা সমর্থন করেন; সেটাকে মুসলিম ঐক্যের বাহন বলে অভিহিত করেন; সেটা অব্যাহত রাখার উপ-দেশ দেন এবং সিন্ধীকে সংশোধনমূলক কিছুটা পরামর্শও প্রদান করেন। এখানেই মওলানা মাহমূদের সাথে সিন্ধীর শিক্ষাদানমূলক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

গোঠপীরঝাণ্ডায় দারুর্-রাশাদ মাদ্রাসা স্থাপন

দেওবন্দ থেকে ফিরে এসে সিন্ধী ইমরোটে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা দু'বছর চালিয়ে যান; আরবী ও সিন্ধী ভাষার কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তা ছাড়া 'হিদায়াতুল্ ইখ্ওয়ান' নামক একটি মাসিক পত্রিকাও প্রতিষ্ঠা করেন। এর পর তিনি মুর্শিদের ৪র্থ খলীফা মওলানা

রাশেদুল্লাহ্‌র সহযোগিতায় ১৩১৯ হিজরী মুতাবিক ১৯০১ খৃস্টাব্দে গোঠ-পীরঝাণ্ডায় 'দারুর্-রাশাদ' নামক একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং দীর্ঘ সাত বছর (১৯০১-১৯০৯) একনিষ্ঠভাবে ঐ মাদ্রাসার শিক্ষাদান ও পরিচালনায় নিয়োজিত ছিলেন। ঐ মাদ্রাসার পরীক্ষা গ্রহণের জন্য একবার দেওবন্দ থেকে মওলানা মাহমূদ ও শায়খ হুসাইন বিন মুহসিন আনসারী আগমন করেছিলেন।[১৩]

দেওবন্দে জমীঅতুল আনসার গঠন

১৩২৭ হিজরীর রমযান মুতাবিক ১৯০৯ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে মওলানা মাহমূদুল হাসান মওলানা সিন্ধীকে সিন্ধু থেকে দেওবন্দে ডেকে নেন এবং সেখানে অবস্থান করে 'জমীঅতুল্-আনসার' (সাহায্যকারী দল) -এর প্রতিষ্ঠা ও সাংগঠনিক কাজ করার নির্দেশ দেন। দীর্ঘ ১৮/১৯ বছর (১৮৯১-১৯০৯) আধ্যাত্মিক সাধনা, জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষকতা করার পর সিন্ধী আবার তাঁর পুরনো শিক্ষাগারে শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মওলানা মাহমূদের সাহচর্যে 'জমীঅতুল্-আনসার'-এর সেক্রেটারিরূপে কাজ করতে আরম্ভ করেন। জমীঅত গঠনে মওলানা মুহাম্মদ সাদিক সিন্ধী, মওলানা আবু মুহাম্মদ আহমদ লাহোরী ও মৌলবী আহমদ আলী সিন্ধীর সহায়তা করেন। এই জমীঅতের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আলীগড় কলেজ ও দেওবন্দ মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুসদৃশ সম্পর্ক স্থাপন করা।[১৪] ১৯১০ সালে দেওবন্দে অনুষ্ঠিত 'জলসা-এ- দাস্তারবন্দী'-তে আলীগড়ী নেতা সাহেবযাদা আফতাব আহমদ খান (১৮৬৭...) এই প্রস্তাব করেছিলেন যে, দারুল উলূমে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা আলীগড় কলেজে ইংরেজী পড়তে যাবে এবং আলীগড় কলেজের গ্র্যাজুয়েটরা আরবী শিক্ষার জন্য দেওবন্দ মাদ্রাসার শরণাগন্ন হবে। কিন্তু এই কর্মসূচীতে কোন সুফল ফলে নি। আলীগড় থেকে সর্বপ্রথম যে ছাত্রটি দেওবন্দে পড়তে গিয়েছিল, সেই শিক্ষার্থী ইংরেজ সরকারের একজন গোয়েন্দা বলে প্রমাণিত হয়।[১৫]

'জমীঅতুল -আনসার'-এর অন্য একটি অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে, মওলানা মাহমূদের একটি সুদূরপ্রসারী গোপন কর্মসূচী ছিল। তা হলো—-দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে মুজাহিদদের একটি দল গঠন করা এবং ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। সিন্ধী ঐ কর্মসূচী

অনুযায়ী চার বছর (১৯০৯-১৯১৩) 'জমীঅতুল আনসার' পরিচালনা করেন। জমীঅতের আসল উদ্দেশ্যকে গোপন রেখে ১৯১০ সালে দেওবন্দে 'দাস্তার-বন্দী'র জলসা (পাগড়ী পরিধান অনুষ্ঠান) অনুষ্ঠিত হয়। তাতে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আনুমানিক ত্রিশ হাজার মুসলমান সুধী সমবেত হয়। ঐ সভায় মওলানা আহমদ হাসান আমরুহী সভাপতির ভাষণে বলেনঃ "কোন কোন প্রগতিবাদী বলেন, 'জমীঅতুল্ আনসার' হলো আলীগড়ের 'ওল্ড বয়েজ এসোসিয়েশন'-এর একটি অনুকরণ মাত্র। এটা ঠিক নয়। 'জমীঅতুল -আন্‌সার'-এর আন্দোলন এখন থেকে প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বেই আরম্ভ হয়েছে। এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মাদ্রাসা-এ-আলিয়ার (দেওবন্দ মাদ্রাসা) ঐ ছাত্র, যিনি আজ জ্ঞানের উৎস (মওলানা মাহমূদ) বলে পরিগণিত। ১৯০৯ সালে ঐ আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করে তার নাম রাখা হয়েছে 'জমীঅতুল আনসার'। এ সমিতি অন্য কোন সমিতির অনুকরণ নয়। এর সাথে কারো ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্পর্ক নেই। এর উদ্দেশ্য হলো ঐ জরুরী কর্তব্য সম্পাদন, যার এখন ভীষণ প্রয়োজন রয়েছে।"[১৬]

'জমীঅতুল-আনসার'-এর সর্বপ্রথম অধিবেশন ১৯১১ সালে এপ্রিলের ১৫-১৭ তারিখে মুরাদাবাদ শহরে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়।[১৭]

দিল্লীতে নিযারাতুল মাআরিফে যোগদান

সিন্ধী চার বছর (১৯০৯-১৯১৩) দেওবন্দে 'জমীঅতুল্-আনসার'-এর দায়িত্বে থাকাকালে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। এ ছাড়া কিছুটা ধর্মীয় বিষয় যেমন জিহাদ ইত্যাদি নিয়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের সাথে তাঁর মতানৈক্য হয়। এতে কর্তৃপক্ষ মাদ্রাসার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে বলে আশংকা করেন। তাই সিন্ধী তাঁদের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠেন। ফলে তিনি দেওবন্দ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু মওলানা মাহমূদের সাথে তাঁর সম্পর্ক পূর্বের ন্যায় নিবিড় থাকে। তিনি গোপনে দেওবন্দ মাদ্রাসা এলাকার বাইরে আসা-যাওয়া করতেন। মওলানা মাহমূদের সাথে তাঁর জরুরী আলাপ-আলোচনা অব্যাহত ছিল।[১৮] মওলানা মাহমূদ তাঁর বিপ্লবী দলের কর্মসূচীর অধীনে সিন্ধীকে দিল্লীতে 'নিযারাতুল মাআরিফে' শিক্ষাদানের জন্য পাঠান (১৯১৩)। ১৩৩১ হিজরী মুতাবিক ১৯১৩ সালে দিল্লীতে ফতেহপুরী মসজিদে 'নিযারাতুল-মাআরিফ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা ছিল একটি কুরআন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমান যুবকরা কুরআন শিক্ষা করতেন। আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার ফলে ইসলাম সম্পর্কে মুসলিম যুবকদের মনে যে সব ভুল ধারণা সৃষ্টি হতো, তা দূর করাই ছিল ঐ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ঐ শিক্ষাগারের প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতায় মওলানা মাহমূদের সহযোগী ছিলেন হাকীম আজমল খান (মৃঃ ১৯৩৭) ও নওয়াব ওকারুলমুলক (১৮৪১-১৯১৭)। মওলানা মাহমূদ যেভাবে দেওবন্দে তাঁর সমদর্শীদের নিকট সিন্ধীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি দিল্লীর যুবশক্তির সাথেও তাঁর পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লী গমন করেন এবং ডক্‌টর আনসারীর (১৮৮০-১৯৩৬) সাথে সিন্ধীর পরিচয় করিয়ে দেন। অতঃপর আনসারী মওলানা আবুল কালাম আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) ও মওলানা মুহাম্মদ আলীর সাথে সিন্ধীর পরিচয় করিয়ে দেন। এমনি করে দিল্লীতে মুসলিম ভারতের উচ্চ পর্যায়ের রাজনীতিক ও রাজনীতির সাথে সিন্ধীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[১৯]

কাবুলে হিজরত ও অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ১৯১৮ সালে এর অবসান ঘটে। মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি, রাশিয়া, বেলজিয়াম, সার্ভিয়া, মন্টেনিগ্রো ও জাপান। কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের মধ্যে ছিল জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও তুরস্ক। ঐ যুদ্ধের সুযোগে ভারত উপমহাদেশের বাইরে নানা স্থানে ভারতীয় প্রবাসীদের উদ্যোগে স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামের পাঁয়তারা শুরু হয়। এ দিকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট ভারতের প্রত্যেকটি রাজনীতিক এবং প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন। চারদিকে ধরপাকড় শুরু হয়। তাঁরা একে একে মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর, মওলানা শওকত আলী (১৮৭৩-১৯৩৮), মওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রমুখকে গ্রেফতার করতে আরম্ভ করেন। এমন সময় মওলানা সিন্ধীর নিকট মওলানা মাহমূদের এই আদেশ এসে পৌঁছলোঃ "তুমি কাবুলের পথ ধর এবং আমি হেজাযের পানে ছুটছি।" সিন্ধী এ আদেশ পেয়ে দিল্লী ত্যাগ করে ১৯১৫ সালের এপ্রিলে সিন্ধুতে চলে আসেন। তিন-চার মাস তিনি কাবুলের পথঘাটের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। এক-দিন তিনি শায়খ আবদুর রহীমকে[২০] সাথে নিয়ে কাবুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শায়খ সাহেব সিন্ধীকে সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দেন। সিন্ধী আবদুল্লাহ্,

ফাতিহ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ আলী—এই তিন ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে বেলুচিস্তান ও ইয়াগিস্তান হয়ে বিনা পাসপোর্টে কাবুলের পথে যাত্রা করেন এবং ১৯১৫ সালের ১৫ আগস্ট আফগান সীমান্তে পৌঁছে মাগরিবের নামায আদায় করেন। অতঃপর ১৫ অক্টোবর কাবুলে উপনীত হন। পথিমধ্যে আফগানিস্তানের স্থানীয় সরকারগুলো তাঁর সহায়তা করেন। তিনি কাবুলে ইতিপূর্বে উপনীত অনেক স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের দেখতে পান।[২১]

কাবুল পৌঁছে সিন্ধী 'মুঈনুস- সাল্তানাত' সর্দার ইনায়তুল্লাহ্ খান (আফগান বাদশা আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের পুত্র), 'নায়েবুস্ সাল্তানাত' সর্দার নসরুল্লাহ্ খান (আমীর হাবীবুল্লাহ্র ভাই) এবং স্বয়ং বাদশা আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের সংগে দেখা করে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। বাদশা সিন্ধীর কথাবার্তা ও বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে ভারতের জন্য সেখানে কাজ করে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি বাদশার নিকট নিজেকে শুধু একজন মুসলমানরূপে পরিচিত না করে একজন ভারতীয় মুসলমান বলেই পরিচিত করেন।[২২]

১ম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ভারতের যে সব ছাত্র জার্মানীর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষারত ছিলেন বা যে সব মুক্তিকামী ভারতীয় লোক অন্যান্য দেশে অবস্থানরত ছিলেন, তাঁরা ভারত থেকে ইংরেজ উৎখাতের জন্য জার্মান সরকারের সংগে আঁতাত করেন। এই আঁতাতে তুরস্ক সরকারও যোগ দেন। কারণ জার্মানী ও তুরস্ক---উভয়ই তখন মিত্রশক্তির সংগে যুদ্ধরত ছিল। ঐ সময় হরদয়ালের নেতৃত্বে মৌলবী বরকতুল্লাহ্ ডঃ তারক দাশ ও চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর সহযোগিতায় বার্লিনে জার্মান সরকারের পররাষ্ট্র দফতরের অধীনে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি' নামক একটি দল গঠিত হয়। হরদয়াল ছিলেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে 'গদর' (বিদ্রোহ) নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ যুদ্ধের সময় তিনি বার্লিনে আগমন করেন। তাঁর উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি' কর্তৃক রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, বর-কতুল্লাহ্ ও কতক তুর্কী জার্মান পদস্থ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি 'তুর্কী-জার্মান' মিশন কাবুলে পাঠানো হয়। এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিল আফগান সরকারকে বৃটিশ বিরোধী করে তোলা; ঐ সরকারকে কেন্দ্রীয় শক্তির সাথে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামানোর জন্য চেষ্টা করা এবং তুরস্কের যুদ্ধমন্ত্রী আনওয়ার পাশার জিহাদের আহ্বান মুতাবিক ভারতের আযাদীর জন্য ভারত আক্রমণের ব্যবস্থা করা।[২৩](ক) সিন্ধীর কাবুল প্রবেশের পূর্বেই 'তুর্কী

জার্মান মিশন কাবুলে পৌঁছে যায় (সেপ্টেম্বর ২৬, ১৯১৫) এবং আফগান বাদশার সাথে ঐ মিশনের সদস্যদের দেখা-সাক্ষাত ঘটে এবং বিস্তারিত আলোচনাও হয়। সিন্ধী কাবুলে পৌঁছলে আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান তাঁকে তুর্কী-জার্মান মিশনের সংগে যোগাযোগ করার অনুমতি দেন।[২৩](খ) ইতিমধ্যেই রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের নেতৃত্বে কাবুলে একটি অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন করা হয়। মহেন্দ্র প্রতাপ ও বরকতুল্লাহ্ ছিলেন যথাক্রমে ঐ অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান মন্ত্রী। মহেন্দ্র প্রতাপ মওলানা সিন্ধীকে ঐ অস্থায়ী সরকারে যোগ দিতে অনুরোধ করেন।[২৪] তিনি যোগদান করলে তাঁকে ভারতমন্ত্রী করা হয়। ঐ সরকারে কতক জার্মান এবং তুর্কী সদস্যও ছিলেন।[২৫] কিছু দিনের মধ্যেই মিশনের কর্মসূচী নিয়ে জার্মান সদস্যদের সাথে ভারতীয় সদস্যদের মতানৈক্য ঘটে। সিন্ধী ঐ মতানৈক্য দূর করার চেষ্টা করেন এবং আফগান বাদশার সামনে এক যুক্তিযুক্ত কর্মসূচী পেশ করেন। ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে হিন্দু-মুসলমান সদস্যদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। রাজা মহেন্দ্র মনে করতেন, ভারতে হিন্দুদের প্রাধান্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তাই তাঁরাই মিশনে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী। মুসলমান প্রতিনিধিগণ তা মানতে পারেন নি। মওলানা সিন্ধী এ ব্যাপারে মহেন্দ্রর সাথে একটা সমঝোতায় উপনীত হন। তিনি রাজা মহেন্দ্রকে মুসলমানদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব দিতে বাধ্য করেন।[২৬] আফগান বাদশা 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টির প্রতিনিধিদের এই মতানৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করতে ইতস্তত করেন এবং কূটনীতিক চাল চালতে থাকেন। তিনি একদিকে মিশনকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতেন, অন্যদিকে গোপনে বৃটিশভারত-গভর্নমেন্টের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতেন এবং নিরপেক্ষতার নিশ্চয়তা দিতেন।

জনুদুল্লাহ্ গঠন

সিন্ধীর কাবুলে প্রবেশের পূর্বেই ১৯১৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারিতে সেখানে লাহোরের বিভিন্ন কলেজ থেকে ১৫ জন* শিক্ষিত নওজোয়ান গিয়ে সমবেত

* ঐ ১৫ জনের নাম : আবদুল বারী, আবদুল কাদের, আবদুল মজীদ খান, আল্লাহ নওয়াজ খান, আবদুল্লাহ, আবদুর রশীদ, গুলাম হুসাইন, জাফর হাসান এবক, আবদুল খালেক, মুহম্মদ হাসান, খুশী মুহম্মদ ওরফে মুহম্মদ আলী, আবদুল হামীদ, রহমত আলী, শুজাউল্লাহ্, আবদুল্লাহ নওয়াজ খান।

[মোদাব্বের, মোহাম্মদ, ইতিহাস কথা কয় ; ঢাকা ১৯৮৭, পৃ: ১০৪]

হন। এঁরা সবাই ছিলেন কলেজের ছাত্র। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কে গিয়ে তুর্কীদের সহায়তায় মিত্রশক্তি-বিরোধী যুদ্ধে যোগদান করা। কিন্তু আফগান সরকার তাঁদেরকে কাবুলে রেখে দেন এবং তাঁদের নজরবন্দী করে রাখেন। সিন্ধী নায়েবুস সুলতান সর্দার নসরুল্লাহ্‌র সাথে দেখা করে তাঁদের মুক্ত করেন। তিনি চেষ্টা করেন তাঁরা যেন তুরস্কে যাওয়ার খেয়াল বাদ দিয়ে কাবুলে থেকেই আইন মুতাবিক কাজকর্ম করেন। কিছু দিন পর পেশওয়ার থেকে আরো কিছু নওজোয়ান কাবুলে পৌঁছলে তাঁদের সাথে লাহোরী দলের ঝগড়াঝাটি শুরু হয়। অন্যদিকে বেকারত্ব উভয় দলের মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। সিন্ধী এ সব লক্ষ্য করে তাঁদের মধ্য থেকে আবদুল বারী এম. এ. নামক জনৈক ব্যক্তিকে তাঁদের সভাপতি নিযুক্ত করেন এবং তাঁদের মধ্য থেকে শায়খ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, মৌলবী মুহাম্মদ আলী কাসুরীর ন্যায় কিছু কলেজ শিক্ষিত লোককে ভিন্ন করে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়াদি শিক্ষা দেন। এ ছাড়া সিন্ধী সাহেব ইতিমধ্যে কাবুলে আগত মওলানা মনসূর আনসারী,[২৭] মওলানা সায়ফুর রহমান [২৮] প্রমুখের পরামর্শে কাবুলে সমবেত ভারতীয় নওজোয়ানদের নিয়ে 'জুনূদুল্লাহ্' (খোদাই লশকর) নামে একটি কর্মী বাহিনী গঠন করেন।[২৯] পরবর্তী সময় যে সব নও-জোয়ান ভারত থেকে কাবুলে উপনীত হন, তাঁরাও ঐ দলে যোগদান করেন। এঁদের মধ্যে সামরিক যোগ্যতা অতটুকুই ছিল, সাধারণত মুক্তিবাহিনীর মধ্যে যতটুকু হয়ে থাকে।[৩০] এ দলটি আমীর আমানুল্লাহ্ খানের শাসনা-মলে ৩য় ঈংগ-আফগান যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। অস্থায়ী ভারত সরকার সুগঠিত হলে ঐ বাহিনীকে তাঁদের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

রাশিয়া, ইস্তাম্বুল ও জাপানে মিশন প্রেরণ

কাবুলস্থ ভারতের অস্থায়ী সরকার আমীর নসরুল্লাহ্ খানের অনুমতিতে উপমহাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে বিদেশে তিনটি মিশন পাঠান। ১ম মিশন প্রেরিত হয় রাশিয়ায়। ঐ মিশনে ছিলেন ডঃ মথুরা সিং ও মির্যা মুহাম্মদ আলী। ঐ মিশনের ফলে বৃটিশ গভর্নমেন্টের সাথে রাশিয়ার সম্পর্কে কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়, রুশ-ইংরেজ ঐক্যে কিছুটা ব্যাঘাত জন্মে। ঐক্যের ঐ ফাটল নিরসনের জন্য বৃটিশ কর্তৃক লর্ড কাচনারকে রাশিয়ায় পাঠানো হয়।[৩১] দ্বিতীয় মিশনটি মওলানা সিন্ধীর অভিপ্রায়ক্রমে ইস্তাম্বুলে প্রেরিত হয়। ঐ মিশনে ছিলেন সিন্ধীর কর্ম সহযোগী আবদুল বারী

বি. এ. ও ডঃ শুজাউল্লাহ্। এঁদের ইরান হয়ে ইস্তাম্বুল যাওয়ার কথা ছিল। তৃতীয় মিশনটির অধ্যাপক বরকতুল্লাহ্র প্রস্তাবানুসারে রাশিয়া হয়ে জাপান পৌঁছার কথা ছিল। ঐ মিশনে ছিলেন শায়খ আবদুল কাদের বি. এ. ও ডঃ মথুরা সিং। আমীর নসরুল্লাহ্ খানের অনুমতি পেয়ে উভয় মিশন নিজ নিজ গন্তব্য পথে যাত্রা করে। ইস্তাম্বুলগামী মিশনকে বৃটিশ সরকার ইরানে গ্রেফতার করেন। জাপানগামী মিশনকে রুশ সরকার তাঁদের সীমান্তে গ্রেফতার করে ইংরেজ সরকারের হাতে তুলে দেন।[৩১]

এখানে মনে রাখা ভাল যে, আফগান সরকারের বৈদেশিক নীতি ছিল বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত। আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান ছিলেন বৃটিশ গভর্নমেন্টের তাবেদার। তাই মিশন প্রেরণের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বৃটিশ গভর্নমেন্ট আফগান সরকারকে ভারতীয় রাজনীতিকদের আফগানিস্তান থেকে বিতাড়িত করার নির্দেশ দেন। এতে অনেকের চাকরি চলে যায়। কাবুলের হাবীবিয়া স্কুলের শিক্ষক শায়খ ইব্রাহীম ও মৌলবী মুহাম্মদ আলী কাসুরীর চাকরি বিনষ্ট হয়। তাই তাঁরা ইয়াগিস্তানে চলে আসতে মনস্থ করেন।[৩৩]

রেশমী রূমাল-পত্র

১৯১৪ সালের ১ম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে ভারতীয় বিপ্লবী দলের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি দেওবন্দে মওলানা মাহমূদুল হাসানের বাসভবনে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, ১৯১৭ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব পরিকল্পিত বিপ্লব ঘটাতে হবে। কমিটি ঐ মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে বিপ্লবী দলের সর্বাধিনায়ক মওলানা মাহমূদের হাতে তা অর্পণ করেন। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ছিল--ইতিপূর্বে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে তুর্কী ও আফগান সরকারের সাথে ভারতীয় বিপ্লবী দলের যে সব চুক্তি হয়েছিল, সেগুলো সামনাসামনি আলোচনা করে অনুমোদিত করিয়ে নেওয়া। কথা ছিল, মাহমূদুল হাসান স্বয়ং মক্কা হয়ে তুরস্কে গিয়ে তুর্কী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত চুক্তি নিয়ে কাবুলে আসবেন এবং আফগান সরকার থেকে ঐ চুক্তির অনুমোদন নিয়ে সে সম্পর্কে তিনি তুর্কী সরকারকে অবহিত করবেন। তদনুসারে তুর্কী বাহিনী আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে বৃটিশ ভারত আক্রমণ করবে। এই কর্মসূচীর অধীনে মওলানা মাহমূদ মওলানা সিন্ধীকে কাবুলে পাঠান এবং স্বয়ং কয়েকজন সাথী নিয়ে হজ উপলক্ষে ১৯১৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর তুরস্কের উদ্দেশ্যে বোম্বে ত্যাগ করেন এবং অক্টোবরে মক্কা শরীফে

উপস্থিত হন। সেখানে তিনি বিপ্লবী দলের নেতারূপে তুর্কী সরকার-নিযুক্ত হেজাযের গভর্নর গালিব পাশার সাথে দেখা করেন এবং তাঁর হজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। তিনি তুরস্কের যুদ্ধমন্ত্রী আনওয়ার পাশার সংগে দেখা করার অভিপ্রায়ও উপস্থাপিত করেন। গালিব পাশা তাঁকে একটি পত্র দিয়ে মদীনার তুর্কী গভর্নরের নিকট পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।[৩৪]

মাহমূদুল হাসান গালিব পাশার নিকট থেকে দু'টি পত্র লিখিয়ে নেন: একটিতে ছিল বৃটিশের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আহবান। এটি লেখানো হয়েছিল আফগানিস্তানে, সীমান্তের আযাদ এলাকায় ও ভারতের অভ্যন্তরে প্রচারের উদ্দেশ্যে। এটিকে ইতিহাসে 'গালিব নামা' বলে আখ্যায়িত করা হয়। দ্বিতীয় পত্রটি ছিল আফগান সরকারের নামে। এতে ইতিপূর্বে দূত* মারফত প্রেরিত 'তুর্কী-আফগান' চুক্তির অনুমোদন ছিল। ঐ চুক্তির মর্ম ছিল এই যে, তুর্কী বাহিনী আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারত আক্রমণ করবে। কিন্তু তারা আফগানিস্তানের কোন অংশে হাত দেবে না, বরং প্রয়োজন হলে আফগানবিরোধী শক্তির সংগে লড়তে প্রস্তুত থাকবে। এটাকে ইতিহাসে 'গালিবচুক্তিনামা' বলে অভিহিত করা হয়। বিশ্বযুদ্ধের ফলে পথঘাট নিরাপদ না থাকায় মওলানা মাহমূদ গালিব পাশা ও আনওয়ার পাশার চিঠিপত্র নিয়ে কাবুলে প্রবেশ করতে পারেন নি। মওলানা মুহাম্মদ মিঞা আনসারী হজ্ব শেষে 'গালিব নামা' মাহমূদুল হাসান থেকে নিয়ে ভারত ও আফগানিস্তানে পৌঁছে দেন। এটি ভারতের অভ্যন্তরে প্রচার করা সম্ভব হয় নি। কেবল আযাদ সীমান্ত এলাকা ও আফগানিস্তানে এটি প্রচারিত হয়। আযাদ এলাকার উপজাতিদের নিকট থেকে এর একটি কপি গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে 'রাউলাট কমিটি'র হস্তগত হয়। রেশমী রুমাল -পত্র ফাঁস হওয়ার পরেই' গালিব নামা' ভারত ও আফগানিস্তানে পৌঁছে। তাই ঐ পত্রে কোন ফলোদয় হয় নি। অনুরূপভাবে 'গালিব চুক্তিনামা'টিও আফগানিস্তানে যথাসময় পৌঁছেনি। অবশ্য আমীর আমানুল্লাহ্ খানের আমলে এটি বিপ্লবীদের সাহস বৃদ্ধি করেছিল।[৩৫]

গালিব পাশার পত্র নিয়ে মওলানা মাহমূদ মদীনায় তুর্কী গভর্নরের নিকট যান এবং তাঁকে আনওয়ার পাশার নিকট তুরস্কে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। মদীনার গভর্নর তাঁকে জানালেন যে, আনওয়ার

* রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ প্রমুখ।

পাশা শীগগিরই রসূল করীমের রওযা যিয়ারতের জন্য মদীনায় আসছেন। তাই তাঁকে আর তুরস্কে যেতে হবে না। যথার্থই কিছু দিনের মধ্যে আনওয়ার পাশা মদীনায় এলেন। গভর্নর তাঁর সাথে মওলানা মাহমূদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন। আনওয়ার পাশা তাঁকে বৃটিশের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সহায়তাদানের আশ্বাস দেন। তাঁদের মধ্যে চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। ঐ চুক্তিপত্রকে ইতিহাসে বলা হয় 'আনওয়ার নামা'। আনওয়ার পাশার পত্র ছিল তিনটি ঃ একটি লিখিত হয়েছিল বিপ্লবী দলের নেতারূপে মওলানা মাহমূদের নামে। একটি ছিল ভারতের বিপ্লবী সরকার ও তুর্কী সরকারের মধ্যে-যেটাকে 'বিপ্লবী তুর্কী চুক্তি' বলা যেতে পারে। দ্বিতীয়টি ছিল মুসলিম জাতির প্রতি, যাতে মওলানা মাহমূদের সাথে সহযোগিতা করার নির্দেশ ছিল। তৃতীয়টি ছিল তুর্কী ও আফগান সরকারের মধ্যে। সেটি ছিল বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধ সম্পর্কিত। এটাকে 'তুরস্ক-আফগান চুক্তি' বলা যেতে পারে। প্রথম পত্রটি সম্ভবত মওলানা মাহমুদ মক্কার শরীফ হুসাইন কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ার (১০ জুন, ১৯১৬) মুহূর্তে ধ্বংস করে দেন।[৩৬] দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র মওলানা হাদী হাসান হেজায থেকে বহন করে আফগানিস্তানে পোঁছে দেন।[৩৭] দ্বিতীয় পত্রটির ফটো কপি বিভিন্ন বিপ্লবী কেন্দ্রে পোঁছে দেয়া হয়। এই পত্রের উত্তর কাবুলস্থ ভারতীয় নেতৃবর্গ আফগান সরকার থেকে নিয়ে মওলানা মাহমূদের নিকট মদীনায় পাঠিয়ে দেন।[৩৮] তৃতীয় পত্রটির মর্ম ছিল—আফগান সরকারের অনুমোদন থাকলে ১৯১৭ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি তুর্কী বাহিনী আফগান সীমান্তের মধ্য দিয়ে বৃটিশ ভারত আক্রমণ করবে এবং সাথে সাথে ভারতেও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ঘটবে। কথা ছিল, আফগান সরকার কর্তৃক এই চুক্তির অনুমোদনের পর উত্তরটি মদীনায় অবস্থানকারী মওলানা মাহমূদের মাধ্যমে তুর্কী সরকারের হাতে পোঁছতে হবে; অনুরূপ-ভাবে মওলানা মাহমূদের মাধ্যমে তুর্কী সরকারের যুদ্ধের নির্দেশটি পুনরায় ১৯১৭ সালের ১লা জানুয়ারির মধ্যে কাবুলের সদর দফতরে পোঁছতে হবে। আবার কাবুলের সদর দফতর ঐ খবরটি দিল্লীর সদর দফতরকে দেবে ১৯১৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারির মধ্যে। এর পরেই ৯ ফেব্রুয়ারি তুর্কী বাহিনী আফগানিস্তান যাবে এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারি অভিযান পরিচালনা করা হবে। মওলানা মাহমুদ স্বয়ং ঐ সময় আফগানিস্তানে উপস্থিত থাকবেন।[৩৯] কাবুলস্থ ভারতীয় নেতাগণ উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর নেতৃত্বে ঐ চিঠি নিয়ে আফগান বাদশা আমীর হাবীবুল্লাহ্র নিকট গিয়ে উত্তরের প্রয়াসী হন। পূর্বেই বলা

হয়েছে, তখন আফগানিস্তান ছিল বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত রাজ্য। এর বৈদেশি ও আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা ছিল বৃটিশ ভারতের হাতে। তা আমীর হাবীবুল্লাহ্ বৃটিশ স্বার্থের পরিপন্থী যুদ্ধে জড়িত হতে রাজী হন নি কিন্তু আফগান সরকার ও জনগণ ছিলেন বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন প্রস্তুত। আমীর হাবীবুল্লাহ্‌র পুত্র সর্দার ইনায়তুল্লাহ্ ব্যতীত তাঁর অপর পু সর্দার আমানুল্লাহ্ এবং ভাই তথা প্রতিশ্রুত ভাবী বাদশা নসরুল্লাহ্ বৃটিশের সংগে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।[৪০] সর্দার আমানুল্লাহ্‌র অসন্তু থাকার কারণ ছিল এই যে, বৃটিশ শাসকদের পরামর্শে আমীর হাবীবুল্লা প্রতিশ্রুত নসরুল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে নিজ বড় পুত্র ইনায়তুল্লাহ্‌কে ভাবী বাদশা কর পাঁয়তারা করছিলেন। এতে সর্দার নসরুল্লাহ্‌ও আমীর হাবীবুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন।[৪১] এমতাবস্থায় আমীর হাবীবুল্লাহ্ বাধ্য হয়ে সামরিক বেসামরিক অফিসার ও আযাদ উপজাতীয় সর্দারদের সমবেত করেন এব আলোচনার পর বুঝতে পারলেন যে, মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া সবাই যুদ্ধে জন্য প্রস্তুত। অগত্যা আমীর হাবীবুল্লাহ্ বিপ্লবী দলের নেতাদের সাথে মর্মে এক চুক্তি স্বাক্ষর করলেন (২৪-১-১৯১৬): "আফগান সরকার নিরপেক্ষ থাকবেন; তুর্কী ফৌজ আফগান সীমান্ত-এলাকা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করবে আফগান সরকার বৃটিশ সরকারের নিকট এই কৈফিয়ত দেবেন যে, উপ জাতীয় লোকেরা বিদ্রোহ করে আফগান সরকারের আওতা ছাড়িয়ে গেছে তবে ব্যক্তিগতভাবে কেউ যুদ্ধে যোগদান করলে তাতে তাঁর কোন আপত্তি থাকবে না।" অস্থায়ী ভারতীয় সরকারের নেতৃবৃন্দ তাঁর এতটুকু স্বীকারো ক্তিকেই যথেষ্ট বলে মনে করলেন। তাঁরা ঐ মর্মে আমীর হাবীবুল্লাহ্ নিকট থেকে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নেন।[৪২] সর্দার নসরুল্লাহ্ মওলানা সিন্ধীর নির্দেশে তা নিজের হেফাজতে রাখেন। এদিকে আমীর হাবীবুল্লা খান গোপনে এসব তথ্য সম্পর্কে বৃটিশ সরকারকে অবহিত করেন এব তাঁদের নিকট থেকে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন।[৪৩] আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান থেকে বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধে অবতরণের কোন নিশ্চিত আশ্বা না পাওয়ায় এবং তাঁর নিরপেক্ষতা আঁচ করায় জার্মান মিশন কাবুল ত্যা করেন (মে ১৯১৬)। কিন্তু তুর্কী মিশন আরো কিছুকাল তথায় অবস্থান করেন

মওলানা সিন্ধী ও আমীর নসরুল্লাহ্ খান একজন দক্ষ কারিগরে হাতে ঐ চুক্তিপত্রের পুরো আরবী ভাষ্য যুদ্ধআরম্ভের তারিখ (১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯১৭)-সহ একটি রুমালে রেশমী সুতা দিয়ে খোদিত করেন এবং ত

বাহকের মাধ্যমে মওলানা মাহমূদের কাছে মক্কায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন।[৪৪] এ কাজের জন্য নওমুসলিম শায়খ আবদুল হক কে নিযুক্ত করা হয়। তিনি মূলত ছিলেন বানারসের এক হিন্দু পরিবারের ছেলে। তিনি ইংরেজীতে এম. এ. ছিলেন; মওলানা মাহমূদের মুরীদ এবং তাঁর আন্দোলনের বিশ্বস্ত হুঁশিয়ার কর্মী ছিলেন। তিনি বিপ্লবী দলের গোপন তথ্যের আদান-প্রদান করতেন। তিনি আফগানিস্তান ও ভারতের মধ্যে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। তাঁর ব্যবসায়ের কাপড়-চোপড়ের মধ্যে ঐ রূমালপত্রটি লুকিয়ে রাখা হয়। তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তিনি ঐ রূমাল-পত্রটি সিন্ধুর শায়খ আবদুর রহীমের হাতে পৌঁছে দেবেন এবং তিনি হজ করতে গিয়ে তা মওলানা মাহ-মূদের হাতে তুলে দেবেন। শায়খ আবদুল হক ঐ রূমালটি কাবুল থেকে পেশওয়ার পর্যন্ত বহন করে আনেন। এখানে বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের কড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখে তিনি স্বয়ং তা আর বহন করতে সাহস কর-লেন না। যাক, ঐ পত্রটি কয়েকজনের হাত বদল হয়ে সিন্ধুতে শায়খ আবদুর রহীমের হাতে পৌঁছে। গোয়েন্দা পুলিশ ঐ পত্রটি তাঁর নিকট থেকে উদ্ধার করে। তিনি কোন মতে পুলিশের নজর এড়িয়ে পলায়ন করেন এবং চিরতরে আত্মগোপন করেন।[৪৫] রেশমী পত্রটি লেখা হয়েছিল ১৯১৬ সালের ৯ জুলাই এবং তা গোয়েন্দা বিভাগের হাতে ধরা পড়ে আগস্ট মাসে।

বৃটিশ গভর্নমেন্ট এ পত্রটি উদ্ধার করে বিপ্লবী দলের সমস্ত গোপন তথ্য সম্পর্কে অবহিত হন। চারদিকে ধরপাকড় শুরু হয়। হেজাযে ইতিমধ্যে শেরিফ হুসাইন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হন (জুন ১০, ১৯১৬)। বৃটিশ গভর্নমেন্টের ইংগিতে তিনি মক্কায় মওলানা মাহমূদকে গ্রেফতার করেন (ডিসেম্বর ১৯১৬) এবং বৃটিশের হাতে তুলে দেন। ভারতেও অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। এ দিকে বৃটিশ সরকারের নির্দেশে আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান কাবুলে মওলানা সিন্ধীকে ১৯১৭ সালের জুনে নজরবন্দী করেন এবং একটি সংকীর্ণ ঘরে আবদ্ধ করে রাখেন। বিপ্লবী দলের অন্যান্য নেতাদেরকেও আটক করা হয়। আটককৃত লোকদের সংখ্যা কত ছিল, তা অজ্ঞাত। সিন্ধীর ভাষ্য মতে, তিনি সহ ২০/২৫ জন একটি সংকীর্ণ ঘরে নজরবন্দী ছিলেন।[৪৬] মওলানা সিন্ধীকে পরবর্তী সময় জালালাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়। আমীর হাবীবুল্লাহ্ যদিও বৃটিশের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু তাঁর ভ্রাতা নসরুল্লাহ্, পুত্র আমানুল্লাহ্ এবং আফগান সরকারের একটি শক্তিশালী দল বৃটিশ বিরোধী ছিলেন। এঁদের মাধ্যমে সেখানে একটি 'যুদ্ধদল' গঠিত হয়েছিল।

অধিকাংশ জনসাধারণ ছিলেন তুর্কীপন্থী। তাঁরাও যুদ্ধে আগ্রহী ছিলেন। আমীর হাবীবুল্লাহ্ বিরোধী কর্মকর্তাগণ চাইতেন, আফগানিস্তানের উপর বৃটিশের হস্তক্ষেপ না থাকুক এবং দেশে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক। ঐ পরিস্থিতিতে আমীর আমানুল্লাহ্ খানের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে আমীর হাবীবুল্লাহ্র বিরুদ্ধে বিপ্লবের লক্ষণ দেখা দেয়।[৪৭] ১৯১৯ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি আমীর হাবীবুল্লাহ্ আততায়ীর গুলীতে জালালাবাদের নিকটস্থ লাগমান জেলার গোশ নামক কেল্লায় নিহত হন। তাঁর নিহত হওয়ার পর তাঁর ভাই নসরুল্লাহ্ (প্রতিশ্রুত বাদশা) জালালাবাদে নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু আমীর আমানুল্লাহ্ খান সামরিক বাহিনীর সহায়তায় নসরুল্লাহ্কে ক্ষমতাচ্যুত করে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন ফেব্রুয়ারি ১৯১৯)।* নসরুল্লাহ্ জেলে মারা যান। আমানুল্লাহ্ ক্ষমতায় আসার পরক্ষণেই মওলানা সিন্ধীকে আনুমানিক এক বছর আট মাস কারা-বরণের পর মুক্ত করেন এবং জালালাবাদ থেকে কাবুলে ডেকে এনে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। নজরবন্দী অবস্থায়ও আমীর আমানুল্লাহ্ তাঁকে মাঝে মধ্যে ডেকে এনে আলাপ করতেন এবং একবার তাঁকে আর্থিক সাহায্যও দিয়েছিলেন।[৪৮]

আমীর আমানুল্লাহ্ খাঁর আমলে সিন্ধীর কর্মতৎপরতা

আমীর আমানুল্লাহ্ খান ছিলেন স্বাধীনচেতা লোক। আফগানিস্তানের উপর বৃটিশ গভর্নমেন্টের হস্তক্ষেপ ও মুরব্বীয়ানা তাঁর কাছে ভাল লাগতো না। তাই তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেন। ফলে বৃটিশ ভারতের সাথে তাঁর যুদ্ধ বাধে (মে-জুন ১৯১৯) সেটা ছিল তৃতীয় ইংগ-আফগান যুদ্ধ। যুদ্ধের সময় দেশের পূর্বাঞ্চলে

---

* এডামেক বলেন: Amanullah was in possession of Kabul treasury and the arsenal and was therefore in a position of strength. The Kabuli troops then announced their support of Amanullah, who was proclaimed king. On February 27, Nasrullah, Inayatullah and members of the Musahiban family were arrested by the troops of Jalalabad; the following day Nasrullah abdicated and joined Inayatullah in offering baya (allegiance) to Amanullah. [Ludwig W. Adamec, Afghanistan, California, 1967, pp. 108-109]

আফগান সরকারকে কিছুটা নতি স্বীকার করতে হলেও বিজয় আমানুল্লাহ্ খানের ভাগ্যেই জোটে।* সেনাপতি নাদের খানের নেতৃত্বে আফগান বাহিনী কোহাট পর্যন্ত দখল করে। ১৯১৯ সালের ৮ আগস্ট রাওয়ালপিণ্ডিতে বৃটিশ ভারতের গভর্নমেন্টের সাথে আমানুল্লাহ্ খান সরকারের সন্ধি হয় এবং ফলে বৃটিশ গভর্নমেন্ট আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেন। ঐ যুদ্ধে মওলানা সিন্ধী, তাঁর খোদাই লশকর ও ভারতীয় বিপ্লবী নেতাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। কাবুলস্থ বৃটিশ দূত হেমক্রে বলেছিলেনঃ "ঐ বিজয় আফগান সরকারের নয়, বরং তা হলো উবায়দুল্লাহ্র।"[৪১] আফগান সরকারও মওলানা সিন্ধী ও তাঁর সহযোগীদের সক্রিয় ও সফল ভূমিকার স্বীকৃতি দেন। তখন থেকেই আমীর আমানুল্লাহ্ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে সিন্ধীর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। পক্ষান্তরে, সিন্ধীও আফগান গভর্নমেন্টকে নিজ গভর্নমেন্ট বলে মনে করতেন এবং আফগানিস্তানের মংগল সাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। এ মর্মে সিন্ধীর ভাষ্য হলোঃ "আমীর আমানুল্লাহ্ খানের শাসনামলে আমি কিছু দিন, বলতে গেলে, নিজ গভর্নমেন্টেরই কতেকটা ঝলক দেখেছি। প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রীদের উপর আমানুল্লাহ্র যেরূপ আস্থা ছিল, আমার উপর প্রায় অনুরূপ আস্থাই তাঁর ছিল। আমি তাঁর প্রাইভেট আসরে গেলে তিনি আমার প্রতি ঐরূপ শ্রদ্ধাই

* তৃতীয় ইংগ-আফগান যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে আনিস সিদ্দিকী বলেনঃ বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও পর্যাপ্ত গোলাবারুদের অধিকারী হয়েও স্বল্পসংখ্যক আফগান সৈন্যের কাছে তারা যে পরাজিত হতে পারে, তা ইংরেজ সেনাপতিগণ বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁরা যখন খাইবার পাশের অনতিদূরে অবস্থান ক'রে আফগান বাহিনীর পরাজয় এবং আমানুল্লার নতি স্বীকারের সংবাদ শ্রবণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন তখন তাঁদের নিকট পৌঁছল পরাজয়ের মর্মন্তুদ বার্তা। তবু তাঁরা বিশ্বাস করলেন না। বিপুল বিক্রমে পুর্নবার আক্রমণ করার জন্য সে স্থান থেকে সেনাধ্যক্ষগণ নতুন আদেশ জারী করলেন। যুদ্ধরত ইংরেজ সৈনিকগণ প্রাণভয়ে সে আদেশ প্রতিপালন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। কিন্তু পরবর্তী দিবসে বাধ্য হয়ে তারা যখন নব আয়োজনে আবার আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হলো, তখন খোস্ত থেকে আগত পার্বত্য যুদ্ধে বিশেষভাবে পারদর্শী আফগান বাহিনী তাদের নাস্তানাবুদ করে দিলো। চরমভাবে পরাজিত হয়ে পলায়ন পথে অসংখ্য ইংরেজ সৈনিকের অকাল মৃত্যু হলো। বাধ্য হয়ে ইংরেজ সরকার আমানুল্লার কাছে নতি স্বীকার করলো। তারাই প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালো। সন্ধির ব্যাপারে আমানুল্লাহ নাদির খানের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। (আনিস সিদ্দিকী, হৃতভাগ্য বাদশা আমানুল্লাহ, খুলনা, ১৯৬৯, পৃঃ ৩৬)

জ্ঞাপন করতেন, যা তিনি তাঁর খান্দানের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ ও জাতীয় মুরব্বী-দের প্রতি প্রদর্শন করতেন। আমার কোন পরামর্শই তিনি উপেক্ষা করেন নি। তাই আমি আফগানিস্তানের ভবিষ্যত গড়ার কাজে কোন ত্রুটি করি নি।"[৫০]

মওলানা সিন্ধী আমীর আমানুল্লাহ্ খানের শাসনামলে তিন বছর আট মাস (১-৩-১৯১৯--২২-১০-১৯২২) এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মোট সাত বছর সাত দিন কাবুলে থাকার পর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপে তা ছাড়তে বাধ্য হন এবং ১৯২২ সালের ২২শে অকটোবর ভারতের স্বাধীনতা আন্দো-লনকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে রাশিয়ার পথে যাত্রা করেন। এটা জানা কথা, সিন্ধী কাবুলে নির্বাসিত জীবন যাপন করতেন। তাঁর বিপ্লব-পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পরেও তিনি ও তাঁর সহযোগীরা নামেমাত্র হলেও সেখানে একটা অস্থায়ী ভারত সরকার জিইয়ে রেখেছিলেন। সেটা আপাতত অন্যান্য দেশের, বিশেষত বৃটিশ ভারতের দৃষ্টিতে অশোভন ঠেকলেও আমানুল্লাহ্ খান সরকার সহানুভূতিমূলকভাবে তাতে কোন আপত্তি করেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতির চাপে তাঁকে ১৯২২ সালে সেই অস্থায়ী সরকার বন্ধ করে দিতে হলো। মওলানা সিন্ধী বিকল্পরূপে সেখানে 'অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের' একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। সেটা ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে কংগ্রেসের প্রথম শাখা। ডঃ নূর মুহম্মদ ছিলেন এর সর্বেসর্বা। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে মওলানা সিন্ধীই এর প্রেসিডেন্ট এবং যফর হাসান[৫১ক] এর সেক্রেটারি ছিলেন। সে সময় ডঃ আনসারী ছিলেন 'অল-ইণ্ডিয়া কং-গ্রেসের সভাপতি। তাঁর সুদৃষ্টির ফলে এ শাখাটি গয়া অধিবেশনে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করে।[৫১খ] যতটুকু মনে হয়, সিন্ধী কাবুলকে নিজ দেশের মতই আপন করে নিয়েছিলেন। কারণ দেশে ফেরার কোন পথ তাঁর ছিল না। তিনি আফগানিস্তানের কাজ করেই আনন্দ লাভ করতেন। কিন্তু স্বদেশকে স্বাধীন করার যে বাসনা তাঁর মনে প্রজ্বলিত ছিল, তা কখনো নির্বাপিত হয় নি। যদি আন্তর্জাতিক চাপ না থাকতো এবং তিনি কাবুলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারতেন, তবে বোধ হয় তিনি কোন সময় কাবুল ছাড়ার চিন্তা করতেন না। তাঁর ভাষায় বলতে গেলেঃ "যদি নওজোয়ান বন্ধুদের ভবিষ্যত আমার সামনে না থাকতো এবং অস্থায়ী সরকারের কোন কোন কাজে আমার অনিবার্য পরাজয় না হতো, তবে আমি বোধ হয় আমীর আমানুল্লাহ্ খানের শাসন ছেড়ে যেতে রাজী হতাম না।"[৫২] মওলানা সিন্ধী নীতিবান লোক ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত

সুযোগ-সুবিধা, মান-ইজ্জত বা আরাম-আয়েশের জন্য নীতি বর্জন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি যদি দেশের স্বাধীনতার চিন্তাভাবনা বাদ দিয়ে কাবুল সরকারের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতেন, তবে তাঁকে কাবুল ছেড়ে হয়তো দেশে দেশে ফিরতে হতো না। কাবুলে অবস্থানের বহু দিন পর তিনি যখন মক্কায় বসে ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বরে আত্মকথা (যাত্রী ডায়েরি) লিখছিলেন, তখনো তিনি এই আশাই পোষণ করছিলেন যে, হয়তো বা একদিন বিপ্লবী দলের লোকেরা আবার স্বাধীন ভারতে মিলিত হবে। তাঁর ভাষায় বলতে গেলে : "শেষ বছর আমি যখন কাবুল থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম, তখন আমীর আমানুল্লাহ্ খান আফগানিস্তানে আমাদের অস্থায়ী সরকারের কাজ বন্ধ করে দেন। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিধিনীতি পালন করা ছিল আবশ্যকীয়। আমি একটা শর্তে তা মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি যখন কোন অংগীকার করতে ইতস্তত করছিলেন, তখন আমি কাবুল ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমি নিজেকে একটুখানি পরিবর্তিত করে নিলে আরাম ও সম্মানের সাথে কাবুলেই থাকতে পারতাম। কিন্তু তাতে আমার নওজোয়ান বন্ধুদের ভবিষ্যত বিনষ্ট হয়ে যেতো। এ জন্য কাবুল ত্যাগ করা আমি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলাম। আমরা অবশ্য এখন নিশ্চিন্তভাবে একত্রে থাকতে পারছি না। কিন্তু কেউ আমার প্রতি এ অভিযোগ আনতে পারছে না যে, আমি নিজ স্বার্থে অপরের ক্ষতি করেছি। যদি কোন সময় সুযোগ আসে, তবে আমরা সকল বন্ধু আবার একত্র হবো।"[৫৩]

শুধু মওলানা সিন্ধীই কাবুল ত্যাগ করেন নি, শত শত লোক, যাঁরা তুরস্কের জন্য জিহাদ করতে বা মাতৃভূমি ভারতকে মুক্ত করার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে আযাদ সীমান্ত এলাকায় বা আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছিলেন, সীমান্ত যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন, কষ্ট ভোগ করেছিলেন, বিপ্লব-পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর তাঁরা প্রায় সকলেই ধীরে ধীরে কাবুল ছেড়ে চলে যান ; কেউ রাশিয়ায় গিয়ে সমাজবাদী হয়ে যান, কেউ আযাদ ইয়াগিস্তান এলাকায় এসে জিহাদ করে প্রাণ হারান, আবার কেউ নিঃস্ব হয়ে বা বৃটিশের অনুগত হয়ে ভারতে ফিরে আসেন, হয়তো বা কেউ ধর-পাকড়ের ভয়ে চিরতরে আত্মগোপন করেন বা ধরাপৃষ্ঠ থেকেই বিদায় নেন। এক সময় যে মওলানা সিন্ধী কাবুলে জিহাদী কর্মকাণ্ডকে সরগরম করে রেখেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকেও নীরবে নিঃশব্দে কাবুল ছেড়ে চলে যেতে

হলো। স্বাধীনতার জন্য তাঁরা কতইনা মূল্য দিলেন! আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের আন্দোলনের যবনিকাপাত ঘটলেও মূলত সেই আন্দোলন যুগে যুগে যুগিয়েছে স্বাধীনতার ইন্ধন।

রাশিয়া ও তুরস্ক ভ্রমণ

১৯২২ সালের ১৫ অক্টোবর মওলানা সিন্ধী রাশিয়া গমনের পাস-পোর্ট লাভ করেন। ২২শে অক্টোবর তিনি রাশিয়ার উদ্দেশ্যে কাবুল ত্যাগ করেন।[৫৪] নভেম্বর মাসে তিনি সোভিয়েতের তিরমিযে পৌঁছেন।[৫৫] মস্কোতে তিনি সাত মাস অতিবাহিত করেন। সেখানে তিনি 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'-এর সদস্য এবং এর আফগানিস্তান-শাখার প্রেসিডেন্ট-রূপে সরকারী মেহমান ছিলেন এবং তাঁদের শ্রদ্ধাভাজনও ছিলেন।[৫৬] এই ভ্রমণ তাঁর জীবন-দর্শনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এর প্রতিফলনও ঘটে। রাশিয়া ও তুরস্কের তদানীন্তন সভ্যতা ও জীবনবাদকে তিনি তাঁর রচনা ও বক্তৃতায় 'ইউরোপীয় সভ্যতা ও ইউরোপীয় বিপ্লব' বলে বর্ণনা করেন। ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লবের মধ্যে তিনি শাহ্ ওলীউল্লাহ্র চিন্তাধারার প্রতিফলন খুঁজে পান, ঐ সমাজবাদী আন্দোলনে তিনি শাহ্ সাহেবের দর্শনের ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষ করেন। সোভিয়েত রাশিয়া তাঁকে সেখানকার সমাজবাদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য সকল প্রকার সুবিধা প্রদান করেন। সিন্ধীর সহযোগী ভারতীয় হিন্দু-মুস-লিম যুবকরা অনুবাদের মাধ্যমে রাশিয়ার সমাজবাদ অনুধাবনে তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। কারণ তিনি আরবী, ফার্সী ও উর্দু ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানতেন না। ১৯১৭ সালের নভেম্বর থেকে রাশিয়ায় লেনিনের (১৮৭০-১৯২৪) শাসন বলবৎ হয় এবং সেখানে নতুন মতবাদ ও নতুন জীবনধারার জোয়ার নামে। সিন্ধী সেই জীবনধারায় বিশেষভাবে প্রভাবা-ন্বিত হন। কিন্তু রাশিয়ার সমাজবাদের ধর্মহীনতা তাঁকে মোটেও স্পর্শ করতে পারে নি। তিনি সেখানেই ভাবলেন, রুশ সমাজবাদ ভারতে অবশ্যই নিতে হবে। তবে ঐ সমাজবাদের ধর্মহীনতার অভিশাপ থেকে বাঁচার পথও খুঁজে বের করতে হবে। তিনি বলেন: ঐ সমাজবাদ-চর্চার ফল হলো শাহ্ ওলীউল্লাহ্র দর্শন উদ্ভূত আমার ধর্মীয় আন্দোলনকে কিভাবে যুগের ধর্মহীনতার হামলা থেকে বাঁচানো যায়, সেই পন্থা খুঁজে বের করতে আমি সক্ষম হলাম।"[৫৭]

১৯২৩ সালে যফর হাসানসহ মওলানা সিন্ধী রাশিয়া ত্যাগ করে আঙ্কারায় পৌঁছেন। মস্কোতে নিযুক্ত তুর্কী দূত ও মস্কোর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাঁর ঐ সফরের পথ নির্ধারণ করে দেন। বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগ তাঁর ঐ সফরের কথা জানতে পারে নি।[৫৮] সিন্ধী তুরস্কে তিন বছর (১৯২৩-১৯২৬) অতিবাহিত করেন। ঐ সময় কামাল পাশার (১৮৮১-১৯৩৮) নেতৃত্বে তুরস্কে নবজীবনের সঞ্চার হয়। সেখানে খিলাফত উঠিয়ে দেয়া হয় (১৯২৪) এবং তুরস্ককে জাতীয়তাবাদী স্টেটে পরিণত করা হয়। সেখানে আরবী অক্ষরের স্থলে রোমান অক্ষর চালু করা হয়; ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ ও ইউরোপীয় জীবন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়; বিভিন্ন সংস্কার-মূলক কাজে হাত দেয়া হয়। সিন্ধী ঐ সংস্কার ও জাতীয়তাবাদে প্রভাবান্বিত হন এবং ভারতে ন্যাশনাল স্টেট গঠনের চিন্তা করেন। আঙ্কারায় তিনি ইসলামী ঐক্য (প্যান-ইসলামবাদ) সম্পর্কে পড়াশোনা করেন এবং এটা অনুভব করলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে প্যান-ইসলামের কোন কেন্দ্র গড়ে উঠার সম্ভাবনা নেই। এজন্যই তিনি তুর্কীদের ন্যায় বহির্দেশের সাথে কোন সম্পর্ক না রেখে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে স্বীয় ইসলামী আন্দোলনকে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'-এর আওতাভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং কংগ্রেসের অধীনে 'সর্বরাজ্য পার্টি' নামে একটি দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেন।[৫৯] তিনি ভাবলেন, ইসলামী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে হলে কংগ্রেসের মাধ্যমেই করতে হবে।[৬০] ১৯২০ সালে যফর হাসানের সহযোগিতায় এবং তুরস্ক সরকারের অনুমোদনক্রমে তিনি তাঁর দলের রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মসূচী[৬১] উর্দুতে ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশ করেন। তিনি আরো ভাবলেন, এর ফলে তাঁর ইসলামী আন্দোলন যে কোন প্রতিকূল ঝড়ঝাপটার হাত থেকে রক্ষা পাবে; ইসলামের প্রচার ইউরোপেও বৃদ্ধি পাবে।[৬২] এর কপিসমূহ তিনি গোপনে ডাকযোগে ভারতের নেতাদের নামে প্রেরণ করেন। কিন্তু সেগুলো বা তার কিছুটা অংশ ভারত সরকারের হাতে পড়ে। সরকার সেগুলোর প্রবেশ ও প্রচার বন্ধ করে দেন।[৬৩] ১৯২৫ সালের ১৮ মে লাহোরের 'জমিদার'[৬৪] এবং 'সিয়াসত'[৬৫] পত্রিকায় ঐ নিষেধাজ্ঞা প্রকাশিত হয়।[৬৬ক] যফর হাসান তুর্কী ভাষায়ও ঐ প্রচারপত্রের অনুবাদ করেন এবং তা তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল তুর্কী গভর্নমেন্ট যেন এটা বুঝতে পারেন যে, তুর্কী সরকারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোন উদ্দেশ্য মওলানা সিন্ধী ও তাঁর 'সর্বরাজ্য

দলের' নেই, বরং তাঁদের উদ্দেশ্য হলো নিজ দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চিন্তা-চেষ্টা করা।[৬৬]খ উর্দু কপিগুলো ভারত সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়ায় কিছুটা পরিবর্তন সহকারে ঐ কর্মসূচীর ইংরেজী অনুবাদও করানো হয় এবং ভারতীয় বিশ্বস্ত লোকজনের মাধ্যমে তা গোপনে ভারতে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।[৬৭]

সিন্ধী ইস্তাম্বুলে অবস্থানকালে তাঁর প্রচারিত কর্মসূচী সম্পর্কে লালা লাজপত রায়ের (১৮৫৬-১৯২৮) সাথে সামনা-সামনি আলোচনা করেন। ডঃ আনসারীর সাথেও পত্রযোগে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কিন্তু কেউ তাঁর ঐ কর্মসূচীকে পছন্দ করেন নি। অথচ তাঁরা সিন্ধীকে বিকল্প পথও দেখাতে পারেন নি। 'পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্রুর সংগে পত্রালাপ করলে তিনি সিন্ধীর রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মসূচীর কিছুটা প্রশংসা করেন। সেজন্য তিনি আনন্দ অনুভব করেন। তিনি তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন, তাঁর মুরব্বীরা তাঁর কথায় সায় দেন নি, অথচ কোন ভাল বিকল্পও পেশ করতে পারেন নি। বরং তাঁরা তাঁকে হাজার/দুই হাজার বছর পেছনে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এবার সিন্ধীর ভাষায় দেখা যাক ঃ "ইস্তাম্বুলে লালা লাজপত রায়ের সাথে ভাবের বিনিময় হয়; তেমনি ডঃ আনসারীর সাথেও বিস্তারিত কথাবার্তা হয়। আমার মুরব্বীরা সেই কর্মসূচী মানতে পারেন নি, আবার ভাল বিকল্পও বাতলাতে পারেন নি। পরন্তু চেষ্টা করেছেন যেন আমাকে হাজার -দু' হাজার বছর পেছনে নিয়ে দাঁড় করাতে পারেন। হাঁ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাছে তা ভাল লেগেছে বলে তিনি দু' একটি কথা লিখে জানিয়েছেন। সেটা ছিল আমার জন্য আনন্দের বিষয়।[৬৮]

সিন্ধী তাঁর ঐ কর্মসূচীতে অহিংস নীতিকে অবশ্য পালনীয় বলে গণ্য করেন। তিনি 'আত্মকথায়' বলেছেন, এত দিন তিনি অহিংসনীতিকে একটি নীতিমূলক বিষয় বলে মনে করতেন। কিন্তু এই নীতির উপর ভিত্তি করে যে কোন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী গ্রহণ করা যায়, সেটা তিনি মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) থেকেই শিক্ষা করেছেন। তিনি আরো লিখেছেন, মহাত্মা গান্ধী তাঁকে হযরত ঈসার (আ) শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সিন্ধী আরো বলেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হতো; তাই এই শিক্ষা যেখানেই পাওয়া যাবে, মুমিনের হারাধন মনে করে সেখান থেকেই তা লুফে নিতে হবে।[৬৯]

মক্কা গমন

১৩৪৪ হিঃ মোতাবিক ১৯২৫ খৃঃ হজের সময় মক্কায় 'মুতামার-এ-আলম-এ-ইসলাম' -এর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৪ সালের নভেম্বরে ইব্‌নে সুউদ মক্কার শেরীফ হুসাইনকে পরাজিত করে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনিই 'মুতামার-এ-আলম-এ-ইসলাম'-এর অধিবেশন আহবান করেন। সে সময় ভারতসহ মুসলিম বিশ্বের সকল দেশের প্রতিনিধিগণ সেখানে সমবেত হন। সিন্ধী তাঁর ভারতীয় বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখাশোনা করার জন্য সে সময় মক্কা যেতে মনস্থ করেন। কিন্তু 'মুতামার' -এর অধিবেশন শেষ হওয়ার পরেই তিনি ১৩৪৫ হিজরীর সফর মোতাবিক ১৯২৬ সালের আগস্ট -সেপ্টেম্বরে ইটালী হয়ে মক্কায় পৌঁছেন। তিনি নিজের রাজনৈতিক নাজুক অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি সজাগ ছিলেন। তাই হেজায গভর্নমেন্টকে তিনি এ মর্মে নিশ্চয়তা দেন যে, তিনি কোন রাজনৈতিক প্রপ্যাগাণ্ডা করবেন না। হেজায সরকার তাঁকে প্যান-ইসলামবাদী না ভেবে জাতীয়তাবাদী বলে ধরে নিলেন এবং এমনি করে তিনি সেখানে নিরাপদে থাকার সুযোগ পেলেন। গভর্নমেন্ট তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় স্বাধীনভাবে থাকতে দেন। মামুলি কোন সাহায্যের জন্য তিনি কোন সময় আবেদন করলে সরকার সেই প্রয়োজন মেটাতেন।[৭০]

সিন্ধী মক্কায় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তিনজন ভারতীয় ও একটি আরব পরিবার দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হন। শায়খ আবদুল ওয়াহ্‌হাব দিহ্‌লবী, আবদুস্‌ সাত্তার দিহ্‌লবী ও আবুশ শরফ মুজদ্দিদীর গ্রন্থগারসমূহ থেকে তিনি সাহায্য গ্রহণ করেন। আরব খান্দানের শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রায্‌যাক ও শায়খ আবুস্‌ সামাহ্‌ যাহেরের নিকট থেকেও তিনি শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্যপ্রাপ্ত হন।[৭১]

মক্কায় থাকাকালে সিন্ধী ১৩/১৪ বছর (১৯২৬-১৯৩৯) ধরে কুরআন ও শাহ্‌ ওলী উল্লাহ্‌র 'হুজ্জাতুল্লাহিল্‌ বালিগা' গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তফসীর-এ-কুরআনের যে জায়গাগুলো তাঁর কাছে ইতিপূর্বে কঠিন বলে মনে হতো, শাহ ওলীউল্লাহ্‌র নীতি অবলম্বনে তিনি সেগুলো পুরোপুরি আয়ত্ত করেন।

ঐ জ্ঞানচর্চায় তিনি কুরআনে যুগোপযোগী বাস্তব পদক্ষেপের একটা উচ্চ আদর্শ দেখতে পান। তিনি শাহ্‌ সাহেবের বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ যথা

'বুদূর-এ-বাযিগাহ', 'খায়র-এ-কাসীর', 'ত্ফ্হীমাত-এ-ইলাহিয়াহ্', 'সাত্-আত্', 'আল্তাফুল্-কুদ্স্', 'লামআত্' 'তাবীলুল্-আহাদীস্'—ইত্যাদি ভালরূপে অধ্যয়ন করেন। তা ছাড়া শাহ্ সাহেবের রচনাবলী আয়ত্ত করার জন্য যেসব সাহায্যকারী গ্রন্থ রয়েছে, যেমন মওলানা রফীউদ্দীনের 'তাক্মীলুল্-আয্-হান', মওলানা ইসমাঈল শহীদের 'আবাকাত্', মওলানা মুহাম্মদ কাসেমের 'কাসেমুল্-উলূম', 'তাক্বীর-এ দিল্ পযীর' ও 'আব-এ-হায়াত'—সেগুলো তিনি ব্যবহার করেন। তিনি সেখানে ঐ সব কিতাব এবং কুরআন শরীফ শিক্ষাও দেন।[৭২] আল্লামা মূসা জারুল্লাহ্ মক্কায় মওলানা সিন্ধীর নিকট শাহ্ ওলীউল্লাহর দর্শন অধ্যয়ন করেন। আল্লামার ভাষায়, মওলানা সিন্ধী আরবীতে, দেড়শ' দিনে পুরো কুরআনের তফসীর বর্ণনা করেন। আল্লামা মূসা দু'হাজার চারশ' পৃষ্ঠায় তা লিপিবদ্ধ করেন। তন্মধ্যে করাচীস্থ 'বায়তুল্ হিকমত'-এর সেক্রেটারি আবু সাঈদ গুলাম মুস্তফা সিন্ধী ১ম খণ্ড (পৃঃ ৩৪৪) করাচী থেকে প্রকাশ করেছেন, যাতে সূরা-এ-ফাতিহা ও বাকারার তফসীর স্থান পেয়েছে। এ তাফসীর ছাড়াও সিন্ধী 'কুরআনী দস্তুর এ-ইনকিলাব' নামক অন্য একটি গ্রন্থও রচনা করেন, যা ১৯৪৭ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

দেশে প্রত্যাবর্তন

১৯৩৬ সাল থেকেই 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' সিন্ধীকে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা তদবীর করছিলেন। প্রত্যাবর্তনের নিশ্চিত আশা তাঁর ছিল না। বলতে গেলে, তিনি নৈরাশ্যের শিকারেই পরিণত হন।[৭৩] বৃটিশ সরকারের নজরে তিনি ছিলেন তাঁদের শাসন উৎখাত-পরিকল্পনার হোতা।[৭৪] সিন্ধীর কোন কোন বন্ধুও তাঁকে দেশে না ফেরার পরামর্শ দেন। তাঁরা ভাবতেন, সিন্ধীর ন্যায় একজন আযাদীপ্রিয় লোক হয়তো ভারতে পরাধীনতার জীবন যাপন করে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবেন। সে যা হোক, মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (১৮৭৮—১৯৫৭) সিন্ধীকে প্রত্যাবর্তনের জন্য উৎসাহিত করেন এবং এর জন্য বৃটিশ গভর্নমেন্টের কাছে তাঁকে দরখাস্ত করতে অনুরোধ করেন।[৭৫] তদনুসারে তিনি দরখাস্ত করেন। সর্বপ্রথম তাঁর প্রত্যাবর্তনের জন্য চেষ্টা করেন চৌধুরী গুলাম রসূল ও স্যার আবদুল্লাহ্ হারূন। এঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হলে কংগ্রেস এবং অন্যান্য দল চেষ্টা করতে থাকেন। সিন্ধুর প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট তাঁর জন্য জামিন হন। ফলে ১৯৩৭ সালের পয়লা নভেম্বর তিনি দেশে ফেরার অনুমতি পান। ১৯৩৮ সালের পয়লা

জানুয়ারি বৃটিশ সরকার কর্তৃক তাঁকে পাসপোর্ট দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৩ বছরেরও বেশী সময় নির্বাসিত জীবন যাপনের পর ১৯৩৯ সালের ৭ মার্চ তিনি করাচীতে পদার্পণ করেন।[৭৬]

সিন্ধীকে যখন দেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেয়া হয় (১৯৩৮), তখন হজের মওসুম ছিল আগতপ্রায়। তাই তিনি হজ্ করে দেশে ফিরতে মনস্থ করেন। দেশে ফেরার পূর্বক্ষণে উপমহাদেশের পত্র-পত্রিকায় তাঁর জীবনী প্রকাশিত হতে থাকে। তাতে তিনি কিছুটা ভুলভ্রান্তি লক্ষ্য করেন এবং মক্কায় থেকে ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে গুলাম রসূল সম্পাদিত দৈনিক 'ইনকিলাব' পত্রিকায় (লাহোর) নিজ সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেন।[৭৭] তখন অন্যান্য পত্রিকায়ও তাঁর স্বরচিত জীবনীটি পুনর্মুদ্রিত হতে থাকে। 'কায়েদ-এ-মাহ্' পত্রিকায় তা পুন প্রকাশিত হয় ১৩৫৮ হিজরীর রবীউল আউওয়াল মোতাবিক ১৯৩৯ সালের মার্চ-এপ্রিলে। ঐ আত্মজীবনীতে তিনি তাঁর ভাবী কর্মসূচী সম্পর্কে কিছুটা আভাস দেন। তাতে তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সদস্য থাকা, কিন্তু কংগ্রেসের কোন শাখা কমিটিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করা, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি অবলম্বন এবং কংগ্রেসের অধীনে শাহ্ ওলীউল্লাহ্র অর্থনীতির আলোকে স্বতন্ত্র একটি দল গঠনের কর্মসূচী পেশ করেন।[৭৮] তিনি তাঁর ঐ জীবনকথায় এটাও লিখেছেন যে, দেশে ফিরে গেলে তাঁর প্রিয় কর্ম হবে শাহ ওলীউল্লাহ্র দর্শন শিক্ষা দেওয়া ও প্রচার করা। তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে, এই দর্শনের প্রতি তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে উচ্চ শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। ধর্মীয় আলিম, বুদ্ধিজীবী—যে কেউ এই দর্শন চর্চা করবেন, তাঁদের যথাসাধ্য সাহায্য করবেন বলেও তিনি আশ্বাস দেন।[৭৯]

করাচীতে বিবৃতি

সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কম্পানির হজযাত্রীবাহী জাহাজ এস. এস. 'আল্-মদীনায়' মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী করাচী আগমন করলে (৭ মার্চ, ১৯৩৯) তাঁর প্রতি বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কংগ্রেস, জমীঅতুল্ উলামা ও মুসলিম লীগ-এর সাংবাদিকরা জাহাজ ঘাটে সমবেত হন। সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী খানবাহাদুর আল্লাহ্ বখশ এবং রাজস্ব মন্ত্রী এলাহী বখ্শ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্টীমার থেকে অবতরণ করার পর সামরিক কায়দায় সিন্ধীর প্রতি অভিবাদন জ্ঞাপন করা হয়। অতঃপর

তিনি প্রধান মন্ত্রীর সাথে আলাপ করেন। ভারত গভর্নমেন্টের সংগে আলাপ করে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রধান মন্ত্রী যে ভূমিকা পালন করেন, সে জন্য তিনি তাঁকে (প্রধান মন্ত্রী) ধন্যবাদ জানান।

সিন্ধী করাচীতে অবতরণ করে এক সমস্যার সম্মুখীন হন। সে সমস্যাটি ছিল—তিনি কোন্ দলের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন? প্রত্যেক দলই আশা করছিলেন, তিনি তাঁদের দলে যোগদান করবেন। সেই মুহূর্তে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সম্পর্কে সিন্ধী তাঁর মতামত স্পষ্ট করে বলেন: "যাঁরা এ উদ্দেশ্যে আমার নিকট যাতায়াত করছেন যেন আমি মুসলিম লীগের লোক বলে নিজের পরিচয় দেই, তাঁরা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থমনোরথ হবেন।"[৮০]

সিন্ধী জোর দিয়ে বল্লেন: "কংগ্রেস আমার স্বর্গ, আমি কখনো এর বাইরে যাবো না। বিশেষ পর্যালোচনা সহকারে এবং সুদৃঢ় মতামত নিয়েই আমি বহু বছর আগে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হই। ঐ সময় আমি কাবুলে একটি কংগ্রেস কমিটি স্থাপন করি। তদবধি আমি কংগ্রেসের একজন দীন সেবকরূপে এর বাণী প্রচারকল্পে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছি।"

উপসংহারে তিনি বলেন: "ধর্মের উপর সুদৃঢ় আস্থা রেখে আমি বলতে চাই যে, আমি একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী। কোন গোঁড়ামিতে আমি বিচলিত হবো না। কিছু গ্রহণ করার পূর্বে সে সম্বন্ধে আমি পুরোপুরি অবহিত হতে চাই। কংগ্রেসেও যদি দেখতে পাই যে, তাঁদের কার্যের সাথে আমার মতের অমিল রয়েছে, তখন আমি আমার নিজস্ব দল গঠন করবো। তথাপি আমি কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত থাকবো। কারণ এর আদর্শ হলো——ভারতের মুক্তি।"[৮১]

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর কর্মতৎপরতা

দেশে ফিরে সিন্ধী সর্বপ্রথম ১৯৩৯ সালের ৩রা জুন কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'জমীআত-উলামা-এ-হিন্দ'-এর প্রাদেশিক শাখা-'উলামা-এ-বাংগাল'-এর এক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। যে সব রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দলগতভাবে বা যে সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করেছিলেন, ঐ অধিবেশনে তিনি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং প্রায় ২৪ বছরের (১৯১৫-১৯৩৯)

নির্বাসন-লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন : দুই শতাব্দীর উন্নতির ফলে ইউরোপে যে নব বিপ্লব সাধিত হয়েছে, সে সম্পর্কে এ দেশের জনসাধারণ অনবহিত। তাদেরকে সেই বিপ্লবের অনুসরণ করতে হবে ; অতীতের জ্ঞান-গরিমার দোহাই দিয়ে কোন লাভ নেই ; পৃথিবীর জাতিপুঞ্জে স্বজাতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ; ইউরোপীয় রাজনীতির আলোকে এ দেশে জাতীয়তা-বাদের প্রসার ঘটাতে হবে ; ভারতের কৃষক-মজুরদের জীবনের মানকে ইউরোপীয় কৃষক-মজুরদের সমতুল্য করতে হবে। ঐ সভায় সিন্ধী ভারতীয় ও ইউরোপীয় সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করেন। ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে তিনি বলেন : এখানকার হিন্দু-সভ্যতা ও আধুনিক মুসলিম সভ্যতা-উভয়ই ধর্ম ভিত্তিক, আর ইউরোপের বর্তমান আধুনিক সভ্যতা হলো ধর্মবিবর্জিত ; তবে সেটা হলো দর্শন ঐ বিজ্ঞানভিত্তিক। তাই এ দেশে বিবর্তন আনতে হলে সেই সভ্যতাকেও বুঝতে হবে।[৮২]

ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে সিন্ধী বলেন : 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'কে ভারতের সমস্ত রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু বলে ধরে নেয়া উচিত ; তবে কংগ্রেসেরও কর্তব্য হবে—আর্থিক উন্নতিকে আযাদীর ভিত্তি বলে পরিগণিত করা। মুসলিম সমাজে মুসলিম লীগের অত্যধিক জনপ্রিয়তা স্বীকার করেও তিনি বলেন, মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সমকক্ষ হতে পারে না। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেও তিনি তাঁর রাজনৈতিক দর্শনকে সাম্প্রদায়িকতার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যায়িত করেন এবং তাঁর কর্মসূচী অনুসরণ না করার প্রতি জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৮৩]

ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করে 'উলামা-এ-বাংগাল'-এর উক্ত অধিবেশনে সিন্ধী বলেন, ইউরোপের রাজনীতি ধর্মবিবর্জিত ; তাদের সমাজের ভিত্তি হলো দর্শন ও বিজ্ঞান ; এ দেশের ধর্মবিদরা নিজেদের ধর্মীয় দর্শনের সাথে ইউরোপীয় অর্থনীতির সমন্বয় সাধন করতে পারেন। মনে রাখতে হবে, কেবল ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানকে জাতীয় আন্দোলনের অংগীভূত করলেই দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌কে স্বীয় ইমামরূপে পরিগণিত করে তিনি বলেন, তাঁর বিপ্লবী রাজনীতি অবলম্বন করা হলে ইসলামের বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ —উভয় দিকই সুরক্ষিত থাকবে। ইউরোপের বিপ্লবীরাও তাঁর চিন্তাধারা

ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। তাঁর রাজনীতি হৃদয়ংগম করা হলে 'জমীঅতে-এ-উলামা -এ হিন্দ'-এর পক্ষে ইউরোপের বিপ্লব অনুধাবন ও বাস্তবায়ন করা সহজ হবে। ঐ অধিবেশনে তিনি আরো বলেন, দেশের আলিম ও নেতাদের উচিত, বৃটিশ গভর্নমেন্টের দুই শ' বছর ধরে জড়-গজানো শাসন-ব্যবস্থা থেকে যথাসাধ্য ফায়দা গ্রহণ করা; ইউরোপের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পরিহার করা ;[৮৪] ইংরেজীর মাধ্যমে বিজ্ঞানে পূর্ণতা অর্জন করা। সূফী-বাদের উৎস সম্পর্কে তিনি বলেন, ইসলামী দর্শন তথা সূফীবাদ হলো মূলত হিন্দু অধ্যাত্মবাদ, যা ভারতে মুসলিম সূফীদের হাতেই পূর্ণতা লাভ করেছে, আর এই পূর্ণতা সাধনের শিক্ষাগুরু হলেন ইমাম ওলীউল্লাহ্।[৮৫]

১৯৩৯ সালের ১০ ডিসেম্বর মওলানা সিন্ধী সিন্ধুকে সদর দফতর করে কংগ্রেসের অধীনে 'যমুনা-নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টি' নামে একটি রাজ-নৈতিক দল গঠন করেন। এটি অনেকটা কাগজ-কলমেই ছিল; এর প্রসার ঘটে নি। এর আওতা উত্তর-পশ্চিম ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কিন্তু এর গঠনতন্ত্রে এ ব্যবস্থাও রাখা হয় যে, অন্য কোন এলাকাবাসী এই দলে প্রবেশ করতে চাইলে তাতে বাধা-নিষেধ থাকবে না। এর তিনটি আঞ্চলিক উপ-দফতর রাখা হয়—করাচী, লাহোর ও দিল্লীতে। এই পার্টির আদর্শ ও কর্মসূচী বর্ণনা করে সিন্ধী 'দারুর রাশাদ' সিন্ধসাগর' থেকে ১৯৩৯ সালের ১০ ডিসেম্বর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি ঐ নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, গংগা-যমুনা হলো হিন্দু সভ্যতার উৎস, আর সিন্ধু হলো মুসলিম সভ্যতার সুতিকাগার। যদি এই দুই অঞ্চলকে তাঁর (সিন্ধীর) আদর্শে উদবুদ্ধ করা যায়, এই দুই এলাকার লোকদের মধ্যে সৌহার্দ স্থাপন করা সম্ভব হয়, তবে জটিল সমস্যাসমূহেরও সমাধান করা যাবে।[৮৬] ঐ প্রবন্ধের সারকথা হলো ঃ উপমহাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের ভাংগাগড়ার মূলে রয়েছে হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য। কারণ যে কোন কাজ সুচারুরূপে করার জন্য ঐক্যের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি ভারতীয় সূফীবাদের ইতিহাস টেনে বলেন, আলেকজান্দ্রিয়ায় 'নেও-প্লেটোনিক' নামে একদল দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন। সেই পথ অনুসরণ করে মুসলমানদের মধ্যে শায়খ-এ-আকবর মুহ্ঈউদ্দীন ইবনুল আরাবী (১১৬৫-১২৪০ খৃঃ), শায়খ-এ-ইশ্‌রাক শিহাবুদ্দীন সুহ্‌রাওয়ার্দী (১১৪৫-১২৩৪ খৃঃ) প্রমুখ দার্শনিকের জন্ম হয়েছে। তাঁর ভাষায় এ সব সূফী ইমামদের মতবাদের প্রাণবিন্দু হলো 'ওয়াহ্দাতুল ওজূদ

তথা সর্ব-আল্লাহ্‌বাদ। এই দর্শন হলো বেদান্তবাদ'[৮৭] এরই সার-সংক্ষ-রণ। শাহ্‌ ওলীউল্লাহ্‌ এই দর্শনের ছাঁটকাট করে এর পূর্ণতা সাধন করেছেন; এমনি করে তিনি মানবতাবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং কুরআন হাদীসেরই প্রতিধ্বনি করেছেন।[৮৮]

সিন্ধী ঐ প্রবন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উভয় ধর্মের (হিন্দু মুসলমান) মানবসেবকেরা যদি এ আদর্শ সামনে রেখে অগ্রসর হন, তবে ভারত আবার 'মোহনায়' পরিণত হতে পারে। সিন্ধীর ঐ রাজনৈতিক দলের দার্শনিক দিক ও উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে ছিল অহিংস নীতি অবলম্বনে পূর্ণ আযাদী অর্জন করা; কৃষক মজুর ও কারিগরদের আর্থিক অবস্থাকে ইউরোপীয় কৃষক-মজুর ও কারিগরদের সমতুল্য করা। ঐ নীতিমালার মধ্যে আরো ছিল—ভারতকে একটি দেশ না ধরে সেটাকে ইউরোপের ন্যায় কয়েকটি দেশের যৌগিক বলে গণ্য করতে হবে, অভিন্ন ভাষা ও অভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে দেশের প্রদেশগুলোকে পৃথক পৃথক স্টেটে পরিণত করতে হবে। আরো পরিষ্কার কথায় যেখানকার অধিবাসীরা অভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং অভিন্ন বা কাছাকাছি আচার-আচরণের অধিকারী, তারা হবে পৃথক স্টেটের নাগরিক। ঐ পার্টির উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে আরো ছিল নারী-পুরুষদের সবাইকে সমঅধিকার দিতে হবে; গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয়তাবাদকে উন্নত করতে হবে; সর্বসাধারণকে মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে হবে এবং নাগরিকদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে; যে সব ভারতীয় ভাষা এ যাবত আরবী হরফে লিখিত হয়ে আসছে, সেগুলোর জন্য পৃথক পৃথক হরফের ব্যবস্থা করতে হবে; নতুবা সেগুলোকে রোমান হরফে লিখতে হবে, যাতে টাইপ-রাইটারের ব্যবহার অধিকতর সহজ হয়; ইউরোপের উন্নত শিল্পকে এ দেশে বাস্তব রূপে রূপায়িত করা এবং দেশসেবা ও দেশরক্ষায় নারী-পুরুষদের উদবুদ্ধ করার জন্য ইউরোপীয় জীবন-পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে; চিন্তা-নৈতিকতা ও রাজনীতির মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টির জন্য শাহ্‌ ওলীউল্লাহ্‌র দর্শনকে 'পার্টি'র যুক্তিসম্মত আদর্শ বলে গণ্য করতে হবে; গোটা ভারতকে একটি 'ফেডারেশন'-এর আওতায় আনতে হবে; ফেডারেশনের পূর্ণতা অর্জনের জন্য দীর্ঘকাল বৃটিশ কমনওয়েলথ্‌-এর অধীনে থাকতে হবে; উর্দু বা ইংরেজীকে ফেডারেশনের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে; ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে উর্দুকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে রোমান

অক্ষরে লিখতে হবে; কৃষকদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে; পার্টির জমিদার-সদস্যরা কৃষকদের নিয়ে প্রণীত তাঁদের চুক্তি পুরোপুরি মেনে চলবে; অনুরূপভাবে কৃষক সদস্যরাও সরকারের নির্দিষ্ট খাজনা এবং জমিদারদের প্রাপ্য অংশ সঠিকভাবে আদায় করবে।[৮৯]

সূফীবাদ সম্পর্কে মওলানা সিন্ধী ঐ প্রবন্ধে আরো বলেন, আকবর বাদশার (১৫৫৬-১৬০৫) সময় থেকেই ভারতীয় মুসলমান চিন্তাবিদদের একটি দল ইবনে আরাবীর দর্শন বা বেদান্ত দর্শনের সংস্কার ও পূর্ণতা সাধনে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের জীবনধারার জন্য একটি অভিন্ন রাজনৈতিক ভিত্তি প্রস্তুত করা। শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌র দর্শন হলো ঐ সব চেষ্টার সার। সিন্ধীর মতে, এই দর্শন দিয়ে সকল ধর্মের মধ্যে একটা ঐকমত্য ও সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা যেতে পারে এবং এর মধ্যে মানবতার ক্রমাগত ইতিহাসের ব্যাখ্যাও খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে।[৯০]

মওলানা সিন্ধীর এই ঐক্য চিন্তা যথাযথ নয় বলেই মনে হয়। এ চিন্তা অভ্রান্ত হলে ভারতে এত সাম্প্রদায়িক দাংগা ঘটতো না; অমুসলমান সম্প্রদায় মুসলমান জাতির রাজনৈতিক অধিকারকে ধূলিসাৎ করার চেষ্টা করতো না। রাজনৈতিক দিক থেকে একই মতাবলম্বী কংগ্রেসী হিন্দু, কংগ্রেসী মুসলমানের আক্রমণ থেকে এবং কংগ্রেসী মুসলমান কংগ্রেসী হিন্দুর আঘাত থেকে রেহাই পায় নি। বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী হিন্দু বা মায়াবাদী একত্ববাদী মুসলমানও এ সব ক্ষেত্রে রক্ষা পায় নি। বেদান্তবাদী আকবরের ঐক্যের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে; ইসলাম রাজনীতি, ধর্মবিশ্বাস ও কৃষ্টির দিক থেকে স্বতন্ত্র সত্তা বহন করে। ইসলামের তওহীদ অপরাপর ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে স্বতন্ত্র। সন্ন্যাসবাদ বা সূফীবাদ দিয়ে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। দুনিয়া-বিমুখ সন্ন্যাসী ও সূফীরা কোন সময় রাজনীতি করেন নি, আর করলেও তা ব্যর্থ হয়েছে। তাই সিন্ধীর এই চিন্তা বাস্তবে নিষ্ফল হতে বাধ্য।

যমুনা-নর্মদা সিন্ধ্ সাগর পার্টি'র' অধীনে মওলানা সিন্ধী ১৯৩৯ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর পীরঝাণ্ডার (হায়দরাবাদ) 'দারুর রাশাদ' মাদ্রাসায় এবং ২রা ডিসেম্বর করাচীর 'মাযহারুল উলূম' মাদ্রাসায় আলিমদের নিয়ে 'জমীঅত-এ-খুদ্দামুল হিকমত' নামক একটি 'দর্শন সেবা সমিতি' গঠন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী দর্শনের সেবা ও হেফাযত করা এবং মুসলমানদের

পারস্পরিক অনৈক্য দূর করা। ঐ সময় 'যমুনা-নর্মদা সিন্ধ্ সাগর পার্টির রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল দিল্লী, লাহোর ও করাচীতে। এর জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল পীরঝাণ্ডার দারুর রাশাদ মাদ্রাসা, করাচীর মাযহারুল উলূম মাদ্রাসা ও দেওবন্দের দারুল উলূম মাদ্রাসায়। দারুর রাশাদ কেন্দ্রের সভাপতি ছিলেন মওলানা সিন্ধীর মুর্শিদের ৩য় খলীফা মওলানা রশীদুদ্দীন; মাযহারুল উলূম মাদ্রাসা ও দারুল উলূম মাদ্রাসা কেন্দ্রের সভাপতি ছিলেন ঐ মাদ্রাসাদ্বয়ের তত্ত্বাবধায়কগণ। 'জমীঅত -এ-খুদ্দামুল হিকমত'-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত 'বায়তুল হিকমত'-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল শাহ্ ওলী-উল্লাহকে সমস্ত উলূম-এ-শরীআহ্ তথা কুরআন-হাদীস, দর্শন ও রাজনীতির ইমাম মেনে তাঁর রচনাবলীকে মূল ভাষায় শিক্ষা করা ও শিক্ষাদান করা। শাহ্ ওলীউল্লাহ্র রচনাবলীর ব্যাখ্যা-গ্রন্থরূপে শাহ আবদুল আযীয, শাহ্ রফীউদ্দীন, শাহ্ ইসমাঈল ও মওলানা মুহাম্মদ কাসেমের রচনা-সমূহের পঠন ও পাঠন 'বায়তুল হিক্মত'-এর উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'বায়তুল হিক্মত'-এর নীতিমালার মধ্যে এটাও ছিল যে, তাতে কেবল কুরআন এবং শাহ্ ওলীউল্লাহ্র দর্শন শিক্ষা দেয়া হবে এবং এর গ্রন্থাগারে এমন সব গ্রন্থ সংগ্রহ করা হবে, যাতে ভারতীয় ও ইউরোপীয় দার্শনিকদের সাথে শাহ্ সাহেবের তুলনামূলক আলোচনা করা সহজতর হয়।[৯১]

১৯৪০ সালের ১২ জুলাই মওলানা সিন্ধী সিন্ধু প্রদেশের ঠাট্টা জেলা কংগ্রেস-কমিটির কনফারেন্সে লিখিত উদ্বোধনী ভাষণ দেন। তাতে তিনি কংগ্রেসের প্রতি তাঁর প্রীতি ও ভালবাসা ব্যক্ত করেন এবং তাঁর কংগ্রেসী রাজনীতির ফলে ইমাম ওলীউল্লাহ্র দর্শন ও কুরআন অনুধাবনে সহায়তা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে দেওবন্দের ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর দিল্লীর মুসলমান নেতাগণ কিভাবে 'কো-অপারেটর' ও 'নন-কো-অপারেটরে' বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁর একটি খতিয়ান তুলে ধরেন। দেওবন্দ স্কুলের নেতাগণ কিভাবে 'নন কো-অপারেটর' হয়ে আযাদী আন্দোলন করে আসছেন, তা-ও তিনি বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি ইউরোপের উদারনীতি ও প্রযুক্তিনীতি সম্পর্কে বলেন, উদার নীতির ফলে সেই মহাদেশের বেশীর ভাগ দেশ গণ-তান্ত্রিক দেশে পরিণত হয়েছে, আর শিল্প-বিপ্লবের ফলে তাতে বিশেষ আর্থিক

উন্নতি সাধিত হয়েছে। সুতরাং ভারতবাসীদেরকেও সে পথে ধাবিত হতে হবে।[২২]

সিন্ধী বৃটিশ রাজত্বের ফায়দা উল্লেখ করে ঐ অধিবেশনে বলেন, ইংরেজদের শতাব্দীকালীন শাসনের ফলে ভারতবাসী গণতন্ত্র শিক্ষা করেছে; তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ দেশের তরুণদের গণতন্ত্রে উদবুদ্ধ করেছে; ভারতের রাজা, বাদশা এবং নওয়াবদের শাসনও এখন পার্লামেন্টের পরামর্শে চলছে; বৃটিশ শাসন যেমন গণতন্ত্রের তালীম দিয়েছে, তেমনি তা এ দেশকে মেশিনারির সাথেও পরিচিত করেছে; মেশিনে কাজ করার জন্য কারিগর তথা শ্রমিক-মজুর সৃষ্টি করেছে, যাতে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে মেশিনের ন্যায় দায়িত্ব পালন করছে। তাই বৃটিশ সরকারের প্রতি এ দেশের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত।[২৩]

থাট্টা কংগ্রেসের অধিবেশনে ইউরোপের শিল্প-বিপ্লব সম্পর্কে সিন্ধী বলেন, সেখানে যে শিল্প-বিপ্লব সাধিত হয়েছে, তা ভারতে আজ না হয়, কাল অবশ্যই হবে; তা না হয় এ দেশ আর্থিক উন্নতি থেকে বঞ্চিত থাকবে; দেশবাসী পরের অস্পৃশ্য দাস হয়ে থাকবে।[২৪] সিন্ধী ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের প্রশংসার সাথে সাথে এর একটি দুর্বল দিকও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সেখানকার বৈজ্ঞানিক আয়-উন্নতির সাথে ধর্মীয় আইনকানুনের কোন সম্পর্ক নেই; এতে সাধারণত খোদা অস্বীকার করারই উপক্রম হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ধর্ম ত্যাগ তিনি করতে পারেন না; তাই তাঁর মতে এই সমস্যার প্রতিকার 'ওয়াহদাতুল ওজূদের' প্রচার ছাড়া আর কিছুই নেই; এর মাধ্যমে একজন বৈজ্ঞানিককেও খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করানো যাবে। তিনি মনে করতেন, 'ওয়াহ্দাতুল ওজূদ' হিন্দু দর্শনেরও সারকথা; শাহ ওলী-উল্লাহ্ সেটা মেনে নিয়ে এমন একটা দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছেন, যাতে সমস্ত ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ পিপাসা নিবারণ করতে পারে।[২৫]

ঐ অধিবেশনে সিন্ধী দুঃখ করে বলেন, ভারতের বড় বড় লোকের সন্তানরা ঘরবাড়ী বিক্রি করে ইউরোপ গিয়ে বিলাসিতা নিয়ে আসেন; অথচ জ্ঞানবিজ্ঞান তাঁরা কিছুই শেখেন না। তাঁরা পরিশ্রম করতে চান না। কিন্তু এই বিপ্লবের যুগে তাঁদেরকে সব কিছুই করতে হবে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় দিক রক্ষার জন্য সিন্ধী শাহ্ ওলীউল্লাহ্র দর্শন শিক্ষার উপদেশ দেন। তিনি বলেন, হিন্দুরা বেদান্ত দর্শন মান্য করে। তাই তাদেরকে কয়েক মিনিটেই শাহ্ সাহেবের দর্শন শেখানো যাবে।[২৬]

তিনি ভারতের বিগত দু'টি রাজনৈতিক আন্দোলনের জয়-পরাজয়ের কারণ উল্লেখ করে বলেন, কলকাতার নওজোয়ান সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর (১৮৪৮-১৯২৫) নির্দেশে বংগ ভংগ রদ আন্দোলন পরিচালিত হয়; সেই আন্দোলন ছিল নিজ দেশের জন্য; তাই তা জয়যুক্ত হয়েছে। খিলাফত আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন দিল্লীর মুসলমানরা; সেই আন্দোলন নিজ দেশের জন্য ছিল না বলেই তা পরাজয় বরণ করেছে। পুরনো তুরস্ক মার খেয়েছে; নব্য তুরস্কে বিপ্লব ঘটেছে; এর পক্ষে খিলাফত সামলানো মুশকিল ছিল; তাই তুর্কীরা খিলাফত তুলে দিয়ে ইউরোপের আদর্শে জাতীয় সরকার গঠন করেছেন এবং নিজ দেশের উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করেছেন।[১৭]

১৯১৬ সালের 'লখনৌ-চুক্তি'র প্রতি ইংগিত করে থাট্টা অধিবশনে সিন্ধী বলেন, সেই চুক্তিতে একটি গলদ ছিল; তাতে প্রতিনিধিত্বের দিক থেকে মুসলিম গরিষ্ঠ প্রদেশগুলোকে মুসলিম লঘিষ্ঠ প্রদেশে পরিণত করা হয়েছিল। মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি সম্পর্কে সিন্ধী বলেন, আলীগড়পন্থীরা মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং হিন্দু গরিষ্ঠতার বিপরীতে স্বতন্ত্র একটি দল গঠনে সক্ষম হন; দেওবন্দের প্রতিক্রিয়াশীল লোকেরা প্রাধান্য লাভ করেন এবং তাঁরাও মুসলিম লীগে যোগদান করেন; এমনিভাবে সাধারণ মুসলমানরাও কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন; শুধু দেওবন্দের প্রগতি-বাদীরাই 'জমীঅতুল উলামা' ও 'আহরার পার্টি'তে যোগদান করে মুসলিম লীগের বিপরীতে অগ্রসর হচ্ছেন। তবে উদারপন্থী কিছু মুসলমান পূর্ববৎ কংগ্রেসেরই সমর্থক রয়েছেন।[১৮]

কংগ্রেসের সমর্থক হয়েও সিন্ধী মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার সমর্থন করতে ইতস্তত করেন নি। মুসলিম লীগের প্রতি কংগ্রেসের অনুদারতা ও উদাসীনতা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেসের উদাসীনতা লক্ষ্য করে সিন্ধী উক্ত অধিবেশনে বলেন, কংগ্রেসীরা নিজেদেরকে স্বাধীনতার একচেটিয়া অধিকারী বলে মনে করেছেন। যেসব প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে, সেখানেও কংগ্রেসীরা তাদেরকে অধিকার দিতে কুণ্ঠাবোধ করেছেন। কংগ্রেস যদি হিন্দুদেরকে তাদের আত্মঘাতী কাজ থেকে বারণ করতেন এবং মুসলমানদের অধিকার দিয়ে দিতেন, তবে ব্যাপারটা এরূপ দাঁড়াতো না। হিন্দুদের অবিচারের ফলেই 'জমীঅতুল উলামা' ও 'আহরার পার্টি'র' দেওবন্দী নেতাগণ আজ জনসাধারণের সামনে কংগ্রেসের নাম নিতে

ভয় পাচ্ছেন। মুসলমানরা জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী নেতাদের সাথে খিলা ফত ও স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু এখন সর্দার প্যাটে লের (১৮৭৫-১৯৫০) একনায়কত্বের যাঁতাকলে তাঁরা নিষ্পেষিত হচ্ছেন।[৯] কংগ্রেসের ইতিহাসের জের টেনে সিন্ধী থাট্টা অধিবেশনে আরো বলেন উদারপন্থী কংগ্রেসীদের চেষ্টার ফলেই কংগ্রেস উন্নতি লাভ করেছে সুরাট অধিবেশনের (১৯০৭) পর থেকেই কংগ্রেস বিপ্লবী দলে প্রবেশ করতে থাকে। খিলাফত আন্দোলনের প্রথম ভাগেই মহাত্মা গান্ধী বিপ্লবীদের খাতিরে উদারপন্থী লোকদের কংগ্রেস থেকে বের করে দেন। কিন্তু এখন সেই বিপ্লবীরা কংগ্রেস চালাতে পারছেন না। এখন উদারপন্থী কংগ্রেসীরা পুরনো বেশ বদলে বিপ্লবী ঝাণ্ডা উড়িয়ে কংগ্রেসে প্রাধান্য বিস্তার করেছেন চরখা, খদ্দর আর প্যাটেলের একনায়কত্ব এখন কংগ্রেসকে এগিয়ে নিতে পারবে না। আশংকা হচ্ছে, হয়তো বংগদেশ ভারত থেকে আলাদা হয়ে যাবে। এখন মহাত্মা গান্ধীর পুরনো সম্ভ্রম এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সাহসিকতাই কংগ্রেসকে টিকিয়ে রেখেছে।[১০০]

মওলানা সিন্ধী উক্ত অধিবেশনে নাম উল্লেখ না করে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র প্রতি ইংগিত করে বলেন, তিনি লিবারেল নেতা হয়েও কংগ্রেসের কর্মকাণ্ডে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কংগ্রেসের সাথে প্রতিশোধমূলক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন।[১০১]

ঐ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। সিন্ধী তখন বিনা শর্তে বৃটিশের সাহায্য করা প্রয়োজন বলে মনে করেন। তিনি তাঁর কাবুল গমন এবং বৃটিশ শাসন উৎখাতের পূর্বকার পরিকল্পনা উল্লেখ করে বলেন, তখন ধর্মীয় কর্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি সেই কাজ করেছিলেন এবং সেই যুদ্ধে তাঁর পরাজয় বরণ করেছিলেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। বৃটিশের সাথে এখন মুসলমানদের কোন ধর্মযুদ্ধ নেই। তাই এখনকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বৃটিশের বিরোধিতা করা হবে ভ্রমাত্মক। তিনি আরো বলেন বৃটিশ কমনওয়েলথের অধীনে অহিংস নীতি অবলম্বন করে যতটা উন্নতি করা যাবে, তা অন্যভাবে সম্ভব নয়।[১০২]

অতঃপর সিন্ধী তাঁর সদ্য গঠিত 'যমুনা নর্মদা সিন্ধ সাগর পার্টি' সম্পর্কে বলেন, এই পার্টির গঠনতন্ত্রে হিন্দু-মুসলিম ভারতবাসীর প্রতি যত প্রকার অবিচার হওয়ার আশংকা রয়েছে, সেগুলোর পথ রোধ করার ব্যবস্থা রাখ

হয়েছে। মুসলমান সংখ্যা-লঘিষ্ঠ প্রদেশে মুসলমানদের অধিকার নিশ্চিত করা কংগ্রেসের ফরয। এই নতুন পার্টিতে মুসলমানদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই সমঝদার মুসলমানদেরকে এখন কংগ্রেসে টেনে আনা সম্ভব হবে। সিন্ধী তাঁর কর্মসূচী বর্ণনা করে বলেন, তিনি কাবুলে সাত বছর ভারতের জাতীয় কাজ করেছেন, এখানেও তিনি পরীক্ষা-মূলকভাবে সাত বছর তাঁর সংস্কারমূলক কাজ করবেন। তবে তাঁর দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না।[১০৩] ঐ অধিবেশনে সিন্ধী শুক্কুরের হিন্দু-মুসলিম দাংগার কথা উল্লেখ করে বলেন, গান্ধীর কথায় সায় দিয়ে সিন্ধু থেকে কোন হিন্দুরই হিজরত করা উচিত হবে না।[১০৪] তিনি সিন্ধুর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের দায়িত্ব নেবেন বলে নিশ্চয়তা দেন। ঐ অধিবেশনে তিনি আরো বলেন, 'ডিক্‌টেটর মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্' (১৮৭৬-১৯৪৮) সিন্ধুর অধিবাসী। তিনি জিন্নাহ্ সাহেবকে সর্ব-ভারতীয় নেতারূপে নয়, বরং সিন্ধুর একজন উদারপন্থী ভদ্রলোকরূপে কংগ্রেসে আসতে অনুরোধ করবেন; হয়তো তিনি মুসলিম লীগ ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেবেন।[১০৫] সিন্ধী এই উক্তি করেন যে, একটি ফেডারেশন গঠন ছাড়া ভারতের উন্নতির কোন আশা নেই।[১০৬] গান্ধী ও পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সিকান্দর হায়াত খান (১৮৯২-১৯৪২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ গভর্নমেন্টকে সাহায্য করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ জন্য সিন্ধী তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কারণ তিনি ভাবতেন, স্বায়ত্তশাসন অর্জ-নের পথ হলো অহিংস নীতি অবলম্বন। তবে তিনি সিকান্দর হায়াতের প্রতি সম্বোধন করে ঐ ভাষণে এ কথাও বলেন, কেবল বিনা শর্তে যুদ্ধে বৃটিশের সহায়তা করলেই স্বায়ত্তশাসন আসবে না, সেখানেও কংগ্রেসের সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে।[১০৭] 'আহ্‌রারদের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি বলেন, যুদ্ধের সময় স্বাধীনতা আন্দোলন বন্ধ করা উচিত। যুদ্ধশেষে যদি 'হোম্‌রুল' না পাওয়া যায়, তবে একজনের স্থলে দশজনকে কুরবানী দেয়া যাবে।[১০৮] পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪) সম্পর্কে তিনি বলেন, ভবিষ্যত-বিপ্লবের প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি নেহরুকে আপাতত কিছুটা পিছু হটতে এবং বৃটিশের সহায়তা করতে অনুরোধ করবেন। সিন্ধী প্রত্যাশা করেন যে, তাঁর অনুরোধ পালনের পর জিন্নাহ্, গান্ধী ও নেহরু একত্রে বড়লাটের মাধ্যমে বৃটিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে স্বাধীনতা অর্জ-নের ব্যাপারে একটা দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ করবেন। ১৯৩০ সালে

মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। সিন্ধী মনে কর-তেন, সে সময়কার অসহযোগ আন্দোলন, আর ১৯৪০ সালের অসহযোগ আন্দোলন এক হতে পারে না। কারণ যুদ্ধের সময়টি হলো একটি নাজুক সময়। তাই তিনি থাট্টার কংগ্রেস অধিবেশনে বলেছিলেন, নেহরুর সংগে দেখা হলে তিনি তাঁকে ১৯৩০ সাল ও ১৯৪০ সালের আন্দোলনের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা বুঝিয়ে দেবেন। তিনি মন্তব্য করে বলেন, কংগ্রেস তাঁর পার্লামেন্টের রায় অনুসারে বৃটিশ গভর্নমেন্ট থেকে স্বাধীনতার অংগী-কার আদায়ের জন্য অসহযোগ আন্দোলনের আহবান জানালে কোন ফায়দা হবে না। মহাত্মা গান্ধী যদি নিজ দায়িত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেন, তবে তিনি বাধা দেবেন না। কিন্তু তিনি এবং তাঁর দল সে পথে যাবেন না। তিনি সুভাষ বসুকে বাংলায় আইন অমান্য আন্দোলন না করার জন্য অনুরোধ করবেন বলেও ঐ কনফারেন্সে উক্তি করেন।[১০৯]

১৯৪০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর "আমরা কি চাই" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে মওলানা সিন্ধী তাঁর যমুনা-নর্মদা সিন্ধু সাগর পার্টি'র নীতিমালা ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। প্রবন্ধের শীর্ষভাগে তিনি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর মুসলিম নেতৃত্ব কিভাবে আলীগড় কেন্দ্র ও দেওবন্দ কেন্দ্র-এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, সেই ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আলীগড় সৃষ্টি করেছে মুসলিম লীগ' আর দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেছে জমীঅত-এ-উলামা-এ-হিন্দ্'। তিনি বলেন ভারত ভারতবাসীরাই শাসন করবে, 'যে কোন বহির্শক্তি মুসলিম হোক বা অমুসলিমই হোক, যদি ভারত আক্রমণ করে, তবে ভারতবাসী তা রুখে দাঁড়াবে। এর পর তিনি সত্যিকার অর্থে হিন্দুস্তানী তথা ভারতবাসী বলতে কাদেরকে বোঝায়, তার ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, মুসলিম শাসকগণ ৫-৬শ বছরব্যাপী আধিপত্য বিস্তার করে গোটা ভারতে একত্ব, ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই মুসল-মানরাই প্রকৃত অর্থে প্রথম শ্রেণীর হিন্দুস্তানী বা ভারতীয় এবং হিন্দু তথা আর্য হলো দ্বিতীয় শ্রেণীর হিন্দুস্তানী বা ভারতীয়।[১১০ক] ভারতের মুসলমানরা সংখ্যায় কম বলে অনেক সময় তাঁরা হিন্দুদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন করতে চাইতেন না। তাঁদের এই মনোভাব লক্ষ্য করে সিন্ধী ঐ প্রবন্ধে বলেন, শাসন-ক্ষমতা ও আধিপত্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা সংখ্যালঘিষ্ঠতার উপর নির্ভর করে না, বরং তা নির্ভর করে সঠিক চিন্তাধারার উপর। প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেন, খৃস্টানরা এত কম হয়েও সারা

ভারতের উপর শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর মতে, শাসনক্ষমতা হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের মধ্যে অনেক বেশী।[১১০খ]

পুঁজিবাদ সম্পর্কে সিন্ধী বলেন, হিন্দুরা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়তে পারেন না; কিন্তু মুসলমানরা তা পারেন; কারণ তাঁদের কুরআনে পুঁজিবাদের কোন স্থান নেই। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, মহাত্মা গান্ধী মানবতার এত বড় পূজারী হয়েও পুঁজিবাদ ছাড়তে পারন নি, অথচ হাসরত মোহানী (১৮৭৫-১৯৫১) সমাজবাদী হওয়া মাত্রই তাঁর সমস্ত ধনসম্পদ লুটিয়ে দিয়েছেন।[১১১] সিন্ধী বাদশা আলমগীরের প্রশংসা করে বলেন, তাঁর চিন্তাধারা ও দর্শন মুসলমানদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। তাঁদের কর্তব্য হলো---বিদেশী কর্মসূচী বা সহায়তার প্রত্যাশা না করে তারা নিজের ঘর নিজেই সামলাবে।[১১২]

বৃটিশ রাজত্ব ভারতে থাকবে, না কি তা উৎখাত করা হবে, সে সম্পর্কে সিন্ধী ঐ প্রবন্ধে বলেন, যতদিন ভারতবাসী এ মর্মে নিশ্চিত না হবে যে, তারা লড়াই করে দেশ জয় করতে সক্ষম হবে, ততদিনই তাদেরকে অহিংস নীতি অবলম্বন করতে হবে; অসহযোগ আন্দোলন বর্জন করতে হবে; কারণ এটাই প্রস্তুতি গ্রহণের যথাযথ উপায়; যতদিন দেশ শেষ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত না হবে, ততদিন তাদের ছোটখাট যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সমীচীন হবে না। যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বক্ষণে রাজনৈতিক শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা ও সাধারণ শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ নিতে হবে;[১১৩ক] প্রস্তুতি পর্ব শেষ হওয়া পর্যন্ত বৃটিশ উপনিবেশে ইংরেজদের সাথে সমঝোতা করে থাকতে হবে; যমুনা নর্মদা সিন্ধ সাগর পার্টি 'বৃটিশ সরকার থেকে ঔপনিবেশিক শাসন অর্জন করেই ক্ষান্ত হবে। যেসব কর্মের উপর এই স্বাধিকার অর্জন নির্ভর করে, তা সম্পাদন করতে এই পার্টি কুণ্ঠাবোধ করবে না; 'হোমরুল' অর্জিত হলে তা হিন্দু-মুসলিম উভয়ের জন্যই কার্যকর হবে; সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিজ নিজ প্রদেশে আইন প্রণয়ন করবে; যে সব প্রদেশে মুসলিম সংখ্যাধিক্য রয়েছে, স্বভাবতই সেখানে মুসলমানরা আইন রচনা করবেন এবং তাঁরা সেখানে সতিকার ইসলামী ও মানবীয় পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। তবে যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতেই প্রদেশ ও কেন্দ্রে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। ভোট-দাতাগণ মানবতার দৃষ্টিভংগি নিয়ে প্রার্থীদের ভোট দেবেন। এই নীতি অনুসারে মুসলিম প্রধান প্রদেশে মুসলমানরা খাঁটি ইসলামী চিন্তাধারা বজায় রাখতে পারবেন।[১১৩খ]

সিন্ধী উক্ত প্রবন্ধে আরো বলেন, দেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অর্জন করতে যদি দশ-বিশ বছরও লেগে যায়, তবু দেশবাসীকে সবুর করতে হবে। শেষ পর্যন্ত তারা নিশ্চয়ই সফলকাম হবে। তিনি বলেন, তাঁর 'যমুনা নর্মদা সিন্ধ সাগর পার্টি'র' আন্দোলন লাহোর থেকে শুরু করা হবে ; এর দ্বিতীয় কেন্দ্র হবে লখ্‌নৌতে ; আর এ দু'টি কেন্দ্র পরিচালিত হবে দিল্লী থেকে। সিন্ধী তাঁর পার্টি'র গতি-প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে বলেন, এটি সাম্প্রদায়িক দল নয়। আপাতত এতে অমুসলমান না থাকলেও এতে তাদের প্রবেশে কোন বাধানিষেধ নেই। সিন্ধী জোর দিয়ে বলেন, "যদিও সমাজবাদের চরম অর্থনীতির কর্মসূচী আমরা সমর্থন করি না, তবু আমরা শ্রমিক শ্রেণীর রুটি, কাপড়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রশ্নকে উপেক্ষা করতে পারি না।"[১১৪]

মুসলিম লীগ সমর্থকদের প্রতি লক্ষ্য করে সিন্ধী বলেন, তাঁরা ফেডারেল পদ্ধতির গভর্নমেন্টকে ভয় করেন ; তাঁদের যে ভয়, তা পার্লামেন্টে আইন রচনা করে দূর করা যায়। বর্তমানে বৃটিশ-প্রস্তাবিত ফেডারেশনে যে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে, তাতে একটি ধারা বাড়িয়ে নিলেই চলবে। তা হলো-এতদিন যে সব এলাকাকে প্রদেশ বলা হতো, সেগুলোকে স্টেট বলে পরিগণিত করা হোক। যে সব এলাকার লোকেরা অভিন্ন ভাষায় কথা বলে, এবং মোটা-মুটি একই সংস্কৃতির অধিকারী, সেগুলোর প্রত্যেকটিকে এক-একটি দেশ বা স্টেট বলাই হবে সমীচীন।[১১৫]

১৯৪০ সালের ১৭ নভেম্বর মওলানা সিন্ধী শাহ্ ওলী উল্লাহ্'র দর্শন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে দিল্লীর জামেয়ানগরে 'জামিয়া-এ-মিল্লিয়া'র অধীনে 'বায়তুল হিকমত' উদ্বোধন করেন। এই প্রতিষ্ঠানকে 'ইয়াদ্‌গার-এ-শায়খুল হিন্দ'ও (শায়খুল্-হিন্দ্ স্মৃতি) বলা হতো, আবার 'ওলী উল্লাহ্ একাডেমী' নামেও অভিহিত করা হতো। ঐ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পর্কে সিন্ধী ১৯৪০ সালের ২২ নভেম্বর জামেয়ানগর থেকে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি 'জামেয়ায়' 'বায়তুল হিকমত' খোলার অনুমতি ও সহায়তা-দানের জন্য জামেয়ার অধ্যক্ষ (পরে ভারতের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট) ডঃ যাকির হুসাইন (১৮৯৭-১৯৬৯)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌র দর্শন সম্পর্কে সিন্ধী বলেন, এই দর্শন এটাই শিক্ষা দিচ্ছে যে, দুনিয়ার সমস্ত ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো—মানবতার উৎকর্ষ সাধন। সুতরাং 'বায়তুল্-হিক্‌মত'-এর শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভংগি হবে

মানবতার উত্তম সেবক হওয়া। এ প্রসংগে সিন্ধী তাঁর কর্মজীবনের পুরনো ইতিহাস টেনে তাঁর বর্তমান রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগি ব্যাখ্যা করে বলেন, মৌলিক কর্মসূচী অকৃতকার্য হওয়ার পর তিনি এখন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ণ আযাদী হাসিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই কংগ্রেসের অধীনে এমন একটি দল গঠন করতে হবে, যাঁরা 'হোমরুল' অর্জনের জন্য সবশক্তি নিয়োজিত করবেন। তাঁরা নৈরাজ্য এবং কম্যুনিজম-এর উর্ধ্বে থাকবেন। কিন্তু যতদিন এ দেশের উপর বৃটিশের কব্জা থাকবে, ততদিন জনসাধারণের জন্য 'হোমরুল' ছাড়িয়ে পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হবে না[১১৬] এ পরিস্থিতিতে জনগণের সংগে নেতাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে; তাদেরকে সঠিক কর্মসূচী না দিয়ে বিগত পঞ্চাশ বছরের ন্যায় শুধু শুধু রাজনৈতিক শ্লোগানে উত্তেজিত করা সমীচীন হবে না। পরিশেষে ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেন, এই বিপ্লব-যুগে শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়িত করার জন্য দেশবাসীকে ইউরোপ থেকে কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।[১১৭]

এখানে এটা বলে রাখা ভাল যে, দিল্লীর জামেয়াস্থ বায়তুল্ হিক্‌মত ছিল সিন্ধী স্থাপিত কেন্দ্রীয় বায়তুল হিকমত। কিন্তু কেন্দ্রীয় বায়তুল্ হিক্‌মত প্রতিষ্ঠার পূর্বেই-এর ৪টি শাখা-বায়তুল হিকমত গোঠ পীরঝাণ্ডার দারুর রাশাদ (২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৯), করাচীর মাযহারুল উলূম (২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৯), ভাওয়ালের দীনপুর (২২ অক্‌টোবর ১৯৪০) এবং লাহোরের ফারুকগঞ্জে (নভেম্বর ১৯৪০) স্থাপিত হয়েছিল।

১৯৪১ সালের জুন মাসে মাদ্রাজ প্রদেশের কুম্বাকুনামে 'পাকিস্তান-প্রস্তাবের' বিরুদ্ধে আয়োজিত এক জনসভায় মওলানা সিন্ধী সভাপতিত্ব করেন। জানা কথা, ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক সভায় ইতিহাস বিখ্যাত 'লাহোর প্রস্তাব' তথা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত হয়। সিন্ধী ছিলেন পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধী। তিনি কুম্বাকুনামের জনসভায় মুসলমানদের সম্বোধন করে বলেন, ভারতের কোন অংশকে 'পাকিস্তান' বলবেন না। তিনি পাকিস্তানপন্থীদের দাবিদাওয়া ও চিন্তাধারা উল্লেখ করে বলেন, "আমার পরামর্শ হলো আপনারা ঐ স্কীম-প্রণেতাদের কথা কানে আনবেন না।"[১১৮]

সিন্ধী ঐ সভায় আরো বলেন, কংগ্রেসের আওতায় অন্য একটি রাজনৈতিক দল গঠন করতে হবে; গান্ধীর দলের কাছে মুসলমানরা যেমন

সাফল্যের কোন আশা করতে পারে না, তেমনি 'সমাজবাদীদের' সাথে থেকেও তারা নিজস্ব কোন আন্দোলন পরিচালনা করতে সক্ষম হবে না।[১১১] তাই নিজেদের দল (যমুনা-নর্মদা সিন্ধ্ সাগর পার্টি) গঠন করতে হবে, যাতে ধর্ম ও সামাজিক অর্থনীতির সমাবেশ থাকবে। ঐ পার্টির লক্ষ্য হলো—তা বৃটিশ গভর্নমেন্ট থেকে 'ডমিনিয়ন স্টেটাস' হাসিল করবে; কংগ্রেসকে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে পরিণত করবে। তিনি তাঁর ফেডারেশন ও স্টেট গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করে বলেন, যে অঞ্চলের লোকেরা অভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং তমদ্দুনের দিক থেকে কাছাকাছি হবে, সেই অঞ্চলকে স্বতন্ত্র স্টেটে পরিণত করা হবে। এতে ধর্মীয় গরিষ্ঠতা ও লঘিষ্ঠতার প্রভাব প্রদেশ তথা স্টেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ফেডারেশনের কেন্দ্রে বৃটিশ ক্ষমতার পাশাপাশি প্রত্যেক স্টেট থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবে। কেন্দ্রের হাতে থাকবে শুধু দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতি। সিন্ধী মন্তব্য করেন, যতদিন কংগ্রেস তাদের আন্দোলন ত্যাগ না করবে, ততদিন তারা 'ডমিনিয়ন স্টেটাস' অর্জন করতে পারবে না। তিনি তাঁর পার্টির গতি-প্রকৃতি বর্ণনা করে আরো বলেন, তাঁর পার্টির আদর্শ হলো তাতে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকবে; সন্ত্রাস ও অনিয়মতান্ত্রিকতা থাকবে না; 'সোশ্যালিস্টদের' ধর্মহীনতাকেও সেখানে কোন স্থান দেয়া হবে না। ঐ পার্টির অন্যতম নীতি হবে—ভারতের সকল ভাষাকে রোমান অক্ষরে লিখতে হবে; নারী-পুরুষদেরকে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেয়া হবে; নারী-পুরুষ-সবাইকে দেশরক্ষার কাজে অংশ নিতে হবে; ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে উপযুক্ত লোক এ দেশের সাহায্যে এগিয়ে আসলে তাদের স্বাগত জানাতে হবে। শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌র দর্শন হবে এই পার্টির যুক্তিযুক্ত ভিত্তি। বায়তুল হিকমতে এই দর্শনই শিক্ষা দেয়া হবে।[১২০]

১৯৪৪ সালের মার্চে মওলানা সিন্ধী উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন। দিল্লী থেকে দেওবন্দ, লুধিয়ানা ও কাসূর হয়ে তিনি লাহোরে উপনীত হন। এ সময়ে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। কিন্তু তাঁর কাজ ও পরিশ্রমের বিরাম ছিল না। অসুস্থতা নিয়েও তিনি সিন্ধু-হায়দারাবাদের 'জমীঅত-এ-তালাবা-এ-আরাবিয়া'র বিশেষ অনুরোধে ১৯৪৪ সালের ১৭ এপ্রিল হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত তালাবা-এ-আরাবিয়া'র সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভা-সমিতিতে এটাই ছিল তাঁর সর্বশেষ যোগদান। ঐ অধিবেশনে তিনি জিহাদের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, এর দু'টি স্তর আছে। কোন কোন

সময় মুসলমান বাদশার অধীনে জিহাদ করা হয়, আবার কখনো কখনো শাসন-ক্ষমতা ও সামরিক শক্তি না থাকা সত্ত্বেও মুসলমানের উপর যুদ্ধ ফরয হয়। তখন তারা নিজেরাই নিজেদের দল গঠন করে এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এটাকেই ইউরোপে 'ইনকিলাব' বলা হয়। শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌র দর্শনকে সেখানকার পরিভাষায় 'ইনকিলাব' বলা যায়। এই বিপ্লব সাধনের জন্যই তিনি (সিন্ধী) জাতীয় কংগ্রেসের অধীনে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন। তিনি 'তালাবা-এ-আরাবিয়া'র সভায় এটাও ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেসের অধীনে থাকলেও তিনি মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (১৮৭৮-১৯৫৭) ও মওলানা আবুল কালাম আযাদের ন্যায় মহাত্মা গান্ধীর অনুসারী নন। গান্ধীর সাথে তাঁর কর্মসূচীর কোন সম্পর্ক নেই। গান্ধীর অহিংস নীতি ও নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে তাঁর মিল আছে, আবার গরমিলও রয়েছে। কারণ গান্ধী কোন সময়েই সন্ত্রাস ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে চান না। কিন্তু প্রয়োজনে তিনি (সিন্ধী) সন্ত্রাস ও আইন অমান্য আন্দোলনেও যোগ দেবেন। সিন্ধী বলেন, তিনি যে নিয়মতান্ত্রিকতার শিক্ষা দেন, তা হলো শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌রই প্রদত্ত সবক। ইউরোপের জাতিসমূহ যেভাবে তাদের বিপ্লবকে সুদৃঢ় করেছে, তেমনি তিনিও শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌র আকাঙ্ক্ষিত ইনকিলা-বকে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। তিনি কিভাবে এই বিপ্লব সাধন করবেন, তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, এই বিপ্লবের শিক্ষা নিতে হবে ইউরোপ থেকে। কারণ এ দেশের পুরনো হাতিয়ার এখন আর কোন কাজে আসবে না। কামাল পাশা ও আমীর আমানুল্লাহ্ খান তা ভাল করেই বুঝেছিলেন। তাই ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও সামরিক শিক্ষা ইউরোপ থেকেই নিতে হবে। সিন্ধী এটাও বুঝিয়ে বলেন যে, যদিও তিনি ইউরোপ থেকে বিজ্ঞান ও সামরিক শিক্ষা নিতে চান, কিন্তু তাঁর বিপ্লবী দলের কর্মসূচী হবে শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌র চিন্তাধারাভিত্তিক। তিনি যে এ দেশবাসীকে ইউরোপীয় হওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তাতে তিনি এটাই বোঝাতে চান। তাঁর মতে, বিজ্ঞান ও সামরিক শিক্ষা ইউরোপ থেকে নিতে হলে তা ইংরেজদের নিকট থেকেই ভালরূপে নেয়া যাবে। তাই ইংরেজী ভাষাভাষীদের সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিতে হবে; বৃটিশ কমনওয়েল্‌থ্-এর অধীনে থাকতে হবে।[১২১]

কৃষক-জমিদারের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করে 'তালাবা-এ-আরাবিয়া'র ঐ সভায় সিন্ধী বলেন, কৃষকদের শিক্ষা দিতে হবে; আইন পরিষদে তাদের প্রতিনিধি থাকবে; জমিদারদের সাথে তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকবে না; কৃষকরা

আইন পরিষদে বসেই জমিদারদের নিকট থেকে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করবে। ভারতীয় কম্যুনিজম সম্পর্কে তিনি বলেন, এ দেশে রাশিয়া থেকে আগত একটা আন্দোলন চলছে। ঐ আন্দোলনের কমরেড্রা কৃষকদেরকে জমিদারদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ করতে চান; কিন্তু তা মোটেও তাঁর কাম্য নয়। ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন, সাধারণ ছাত্রদের উচিত—ইংরেজী শিক্ষা করা; এতে তারা ইউরোপের বিপ্লব বুঝতে সক্ষম হবে। আরবী মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে তিনি উপদেশ দিয়ে বলেন, তারা প্রথমে দেওবন্দের ধর্মীয় পাঠ্যসূচী শেষ করবে; এর সাথে যুক্তিবিদ্যার শিক্ষাও গ্রহণ করবে; এতে তাদের পক্ষে শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌র দর্শন বুঝতে সুবিধা হবে। কিন্তু প্রত্যেকটি আরবী ছাত্রকে প্রাইভেটভাবে কিছুটা ইংরেজীও শিখে নিতে হবে, যাতে তারা শুদ্ধ করে ইংরেজী লিখতে ও পড়তে সক্ষম হয়।[১২২]

শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌র দর্শনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে সিন্ধী হায়দরাবাদের ঐ সভায় বলেন, তাঁর দর্শন এখনো ইউরোপের বিপ্লব-আন্দোলনের চাইতে অনেক অগ্রগামী রয়েছে; তাই বর্তমান ইউরোপকে বুঝতে পারলে শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌র দর্শনকে অনুধাবন করা অনেকটা সহজ হবে। সিন্ধী তাঁর অভিপ্রেত রাষ্ট্রের স্বরূপ বর্ণনা করে বলেন, "আমি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই যে, আমরা বৃটিশের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার চিন্তা বাদ দিয়েছি। বর্তমানে আমরা 'ডমিনিয়ন স্টেটাস' অর্জন করতে চাই; আমরা এই উপমহাদেশকে একটি ফেডারেশনভুক্ত উপমহাদেশ করতে চাই; ভারতকে এক দেশ মনে করে তাতে ইউনিটারি পদ্ধতির গর্ভনমেন্ট গঠনের আমি ঘোর বিরোধী। এ উপমহাদেশের প্রত্যেকটি দেশ স্বাধীন হলে তাতে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যারও সমাধান হবে এবং এতে আমরা বৃটিশ গভর্নমেন্টের সাথেও সমঝোতা করতে পারবো।[১২৩]

প্রত্যেকটি স্টেট ও ফেডারেশনের অফিসের ভাষা সম্পর্কে সিন্ধী বলেন, ফেডারেশনের ভাষা হবে উর্দু ও ইংরেজী। অভিন্ন ভাষা ও কাছাকাছি কৃষ্টির অধিকারী প্রত্যেকটি অঞ্চল হবে স্বতন্ত্র একটি স্টেট। অধিবাসীদের মাতৃভাষাই হবে স্টেগুলোর রাষ্ট্রভাষা। জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা দিয়ে সিন্ধী বলেন, 'যমুনা-নর্মদা সিন্ধ্ সাগর পার্টির কাছে জাতি বলতে বোঝাবে ইউরোপীয় রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হলো অভিন্ন ভাষা, কৃষ্টি ও জীবনপদ্ধতি। তদনুসারে সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পশ্তু, কাশমীরী, গুজরাটী, মারহাট্টী ও উর্দু ভাষাভাষীরা হবে পৃথক পৃথক জাতি।[১২৪]

হায়দারাবাদের জলসায় যোগদানের পর সিন্ধী অসুস্থতা সত্ত্বেও একজন সাথী নিয়ে ১৯৪৪ সালের জুনে সিন্ধু প্রদেশের আরবী মাদ্রাসাসমূহের পরিদর্শনে যান। কিন্তু স্বাস্থ্যের অবনতির ফলে সফরের কর্মসূচী বাতিল করে তাঁকে করাচীতে ফিরে আসতে হলো। কথা ছিল, ১৯৪৪ সালের ৪ঠা আগস্ট তিনি লারকানা জেলার শাহদাদকোটে 'মুহাম্মদ কাসেম ওলীউল্লাহ্ থিয়সজিক্যাল স্কুলের' উদ্বোধন করবেন। কিন্তু অসুখ বৃদ্ধি পাওয়ায় ২রা আগস্ট তিনি তাঁর মুদ্রিত ভাষণ শাহ্ দাদকোটে পাঠিয়ে দেন, যা নির্ধারিত সময়ে পাঠ করে শুনানো হয়।[১২৫] সেটাই ছিল তাঁর জীবনের সর্বশেষ ভাষণ। ঐ ভাষণে তিনি বলেন, এ দেশকে ইউরোপ থেকে শিল্পনীতি ও সামরিক নীতি নিতে হবে। তবে সমাজবাদের শিক্ষা নিতে হবে শাহ ওলীউল্লাহ্ থেকে, যিনি ছিলেন দর্শন ও অর্থনীতিতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর সমাজবাদই ইসলামের সংগে খাপ খায়। ঐ ভাষণে তিনি আরো বলেন, উত্তম মর্যাদা লাভ করতে হলে এদেশকে বৃটিশ গভর্মেন্ট ও বৃটিশ কমনওয়েলথের অধীনে আরো দশ-বিশ বছর শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে হবে। শাহ্ ওলীউল্লাহ্-স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে সিন্ধী বলেন, নওজোয়ানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করাই হলো শাহ্ ওলীউল্লাহ্ দর্শন শিক্ষার উদ্দেশ্য।[১২৬]

কিছু দিন করাচীতে মওলানা সিন্ধীর চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু অসুখ বেড়েই চলে। এ সময় তিনি তাঁর মেয়ে ও দৌহিত্রদের অনুরোধে ভাওয়ালপুর স্টেটের দীনপুরে যান এবং সেখানে ১৯৪৪ সালের ২১ আগস্ট বৃহস্পতিবার ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ……… রাজিউন)। তাঁকে রহীম ইয়ার খান জেলার (পাঞ্জাব) খানপুরে সমাহিত করা হয়।[১২৭]

সিন্ধীর মৃত্যুর পর 'Star of India' পত্রিকায় বলা হয়: An acquisition to Islam from the virile Sikh Community, he rendered his people services they can never forget. A follower of the school of the late Shah Waliullah Dehlavi, he preached and no less practised—Islam which was dynamic …… An upright man is God's noblest creation. Such was Moulana Obaidullah Sindhi.[১২৮]

তথ্যনির্দেশ

১-ক. এই জীবন বৃত্তান্তটি মওলানা সিন্ধীর 'যাতী ডায়রী' (আত্মকথা) নামক গ্রন্থ অবলম্ব লেখা হয়েছে। এতে তাঁর জন্ম থেকে কাবুলে অবস্থানের শেষ দিন পর্যন্ত সময়ে ইতিবৃত্ত উর্দু ভাষায় স্থান লাভ করেছে। সিন্ধী যখন মক্কায় অবস্থানরত ছিলে তখন তিনি আরব বন্ধু-বান্ধবদের অবগতির জন্য আরবী ভাষায় তাঁর জীবনের কি কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ঐ সময় তিনি জীবনের গোড়া থেকে আরম্ভ ক কাবুলে গমন, তথায় অবস্থান ও সেখান থেকে বিদায় গ্রহণের ঘটনাবলীকে উর্দুতে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেন। ঐ লেখা শেষ করার তারিখ হলো ২৫শে জুমাদাস সা ১৩৫২ হিঃ মুতাবেক সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ সাল। 'যাতী ডায়রী' নামক এ বইটি (১৪০) ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বর্তমানে বইটি দুষ্প্রাপ্য। এর অনেকটা অ মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী তাঁর 'নকশ-এ-হায়াত' (২) গ্রন্থে (পৃঃ ১৪৩-১৭৮ এবং 'তাহ্‌রীক-এ-রেশমী রুমাল' গ্রন্থে (পৃঃ ২০২-২২৫) উদ্ধৃত করেন।

মওলানা সিন্ধীর দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বক্ষণে ভারতের বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর জীব প্রকাশিত হতে থাকে। সেগুলোতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করে তিনি পত্র-পত্রিক প্রকাশের জন্য স্বয়ং তাঁর 'যাতী ডায়রী' থেকে সংক্ষিপ্তাকারে আত্মপরিচিতি লিখে দে তাঁর ঐ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পরবর্তী সময় বিভিন্ন গ্রন্থ ও সাময়িকীতে স্থানলাভ করে তন্মধ্যে কয়েকটি এইঃ মহম্মদ সরওয়ার সংকলিত 'খুতুবাত-এ-মওলানা উবায়দুল্ল সিন্ধী' সিন্ধ সাগর একাডেমী লাহোর, ১৯৪৪, পৃঃ ৫৭-৭৪, নুকূশ, লাহোর, জু ১৯৬৪ (আত্মজীবনী সংখ্যা), পৃঃ ১৪২০-১৪২৭; বীস্ বড়ে মুসলমান,' দেওব ১৯৭০, পৃঃ ৪০৩-৪০৯

১-খ. খুতুবাত, পৃঃ ৫৮, ১০২

২. ঐ ৫৯

৩. ঐ ১০৩

৪. ঐ ৫৯

৫. ঐ ৬০

৬-৭. ঐ ৬১

৮. ঐ ৬২

৯. ঐ ৬২-৬৩

১০. ঐ ৬৩

১১. ঐ ৬৪-৬৫

১২. ঐ ৬৬

১৩. ঐ ৬৬-৬৭

১৪. ইকরাম, এস.এম.৩৪৭; খুতুবাত ৬৭

১৫. সাইয়েদ মুহাম্মদ মিঞা, উলামা-এ-হক (১), দিল্লী ১৯৪৬, পৃঃ ১২২-২৩

১৬. ঐ ১২২-১২৬

১৭. ঐ ১২৪

১৮. নকশ-এ-হায়াত (২) ১৪৪,

১৯. খুতুবাত ৬৭-৬৮

২০. শায়খ মুহাম্মদ ইব্রাহীমঃ তিনি ছিলেন সিন্ধী হায়দারাবাদী এবং মওলানা সিন্ধীর অকৃত্রিম নওমুসলিম বন্ধু। তিনি ভারতীয় বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি সিন্ধীকে আফগান সীমান্তে পৌঁছানোর কাজে বিশেষ সহায়তা করেন। মিঃ আচার্য কৃপালনী ছিলেন তাঁর ছোট ভাই। শায়খ ইব্রাহীমের হাতে অনেক অমুসলমান ইসলামে দীক্ষিত হয়। কাবুল গমনের পর সিন্ধী এঁর সাথে পত্রালাপ করতেন। রেশমী রুমালপত্র এঁর নিকট থেকেই বৃটিশ গভর্নমেন্ট উদ্ধার করেন। এর পর তিনি গ্রেফতারির ভয়ে আত্মগোপন করেন এবং বলা হয়, শেষ পর্যন্ত তিনি সরহিন্দে পীড়িত হয়ে মারা যান। (নকশ-এ- হায়াত (২), পৃঃ ১৯৪-৯৫

২১. নকশ-এ- হায়াত (২), ১৪৮-৪৯

২২. ঐ ১৫০-১৫২

২৩ক. Ludwig W. Adamec, Afganistan, California, 1967, Pp. 89-90

২৩খ. নকশ্ -এ- হায়াত (২) ১৫৩

২৪. ঐ ১৬৫

২৫. ঐ ১৬২

২৬. ঐ ১৫৮

২৭. মনসুর আনসারী, মওলানা ঃ তাঁর পূর্বকার নাম ছিল -মুহাম্মদ মিঞা আনসারী। তিনি ছিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবীর দৌহিত্র এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিয়াত বিভাগের প্রধান পীরজী আবদুল্লাহ্‌র পুত্র। তাঁর জন্মভূমি ছিল সাহারানপুর জেলার ইঁটা নামক স্থানে। দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতা করেন। আজমীরের দারুল উলূম মাদ্রাসায় কিছু দিন প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করেন। অতঃপর মওলানা মাহমূদের কুরআনের অনুবাদ কার্যে তাঁর সহায়ক নিযুক্ত হন। তিনি ভারতীয় বিপ্লবী দলের সদস্য হন এবং 'জমীঅতুল আনসারে' মওলানা সিন্ধীর সহকারীরূপে দীর্ঘ দিন কাজ করেন। তিনি মওলানা মাহমুদের সাথে মক্কায় গমন করেন এবং হেজাযের গভর্নর গালিব পাশা প্রদত্ত গালিব নামা'টি মওলানা মাহমূদের নির্দেশে ভারতে নিয়ে আসেন। ইতি-পূর্বেই রেশমী রূমালপত্র বৃটিশ গভর্নমেন্টের হস্তগত হয় এবং ধরপাকড় শুরু হয়। তিনি আত্মগোপন করে ইয়াগিস্তানের আযাদ এলাকায় চলে যান। সেখানে কিছু দিন থাকার পর কাবুলে উপনীত হন এবং সেখানে 'গালিবনামা' প্রচার করেন। আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের শাসনামলের শেষের দিকে ভারত সরকারের নির্দেশে তিনি আবার ইয়াগিস্তানে আসতে বাধ্য হন। আমীর আমানুল্লাহ্ খানের শাসনামলে তিনি পুন কাবুলে যান এবং বিদ্যাবুদ্ধির বদৌলতে রাজনৈতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হন। রাজনীতি ও ইসলামী প্রশাসন সম্পর্কে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

তিনি কাবুলে ইনতিকাল করেন। (নকশ-এ-হায়াত (২), পৃঃ ১৮৯-৯০, রেশ রুমাল, পৃঃ ১৮৪)

২৮, সায়ফুর রহমান, মওলানা : তিনি ছিলেন মূলত কান্দাহারের অধিবাসী। উঃ সুরিরা পেশওয়ারে বসতি স্থাপন করেন। তিনি রশীদ আহমদ গংগুহীর নিকট হাদী শিক্ষা করেন। অনেক দিন পর্যন্ত টোঁক স্টেটে শিক্ষকতা করেন। পরে দিল্লীর ফতে পুরী মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং কয়েক বছর সেই দায়িত্ব পালন করে মওলানা মাহমূদের উৎসাহে তিনি বিপ্লবী দলের সদস্য হন এবং ইয়াগিস্তান গম করেন। তিনি কিছু দিন হাজী তরং যাইয়ের সাহচর্যে জিহাদে লিপ্ত হন। অতঃপ কাবুলে চলে যান। আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের শাসনামলের শেষের দিকে মওলা মনসূর ও তাঁকে ইংরেজ সরকারের নির্দেশে ইয়াগিস্তানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু জালালাবাদ পৌঁছার পর সায়ফুর রহমানকে দিয়ে জোরপূর্বক বৃটিশ বিরো কাজ না করার হলফ করানো হয় এবং তাঁকে কাবুলেই থাকতে দেয়া হয়। তি অগত্যা আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত ইংরেজদের পক্ষেই কা করে যান। আমীর আমানুল্লাহ্ খানের শাসনামলে তিনি মুক্ত হন এবং দূত ও মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে বই-পুস্তক রচ করেন। (নকশ-এ-হায়াত (২), পৃঃ ১৮৮-৮৯)

২৯-৩০. নক্শ-এ-হায়াত (২), পৃঃ ১৬০-৬১

৩০. ঐ ১৬৭

৩১. ঐ ১৬৮-৬৯

৩২. ঐ ১৬৯

৩৩. রেশমী রুমাল ১৮০-৮১

৩৪. ঐ ১৮১-৮২

৩৫. ঐ ১৮৪-৮৫

৩৬. ঐ ১৮৫-৮৬

৩৭-৩৮. ঐ ১৯০-৯১

৩৯. ঐ ১৭৪-৭৫

৪০. ঐ ১৯১

৪১. নক্শ-এ-হায়াত (২), ১৭৩

৪২. রেশমী রুমাল ১৯১-৯২

৪৩. ঐ ১৯৬-৯৭

৪৪. ঐ ১৯২

৪৫. ঐ ১৯৩-১৯৫

৪৬. নক্শ-এ-হায়াত (২) ,১৭১

৪৭. ঐ ১৭৩

৪৮. ঐ ১৭৪-৭৫

৪৯. ঐ ১৮০

৫০. ঐ ১৭৫-৭৬

৫১-ক. যফর হাসান ১ম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরের অন্যান্য কলেজ ছাত্রদের (১৫) সাথে তুরস্কের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে কাবুলে উপনীত হন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কের পক্ষে বৃটিশ গভর্নমেন্টের সাথে যুদ্ধ করা। কিন্তু আফগান সরকার তাঁদেরকে কাবুলে রুখে দেন। পরবর্তী সময় তাঁদের অনেকে মওলানা সিন্ধী গঠিত 'খোদাই লশকর'-এ যোগদান করেন। যফর হাসানও ঐ সময় কাবুলে মওলানা সিন্ধীর নিকট সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি সিন্ধীর সাথে রাশিয়া ও তুরস্ক ভ্রমণ করেন এবং ১১ বছর তাঁর সাথে কাটান। তিনি তুরস্কে সিন্ধীর সাথে একযোগে ১৯২৪ সালে একটি রাজনৈতিক 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করেন। ১৯২৬ সালে সিন্ধী হেজায গমন করলে যফর হাসান তুরস্কেই থেকে যান এবং সেখানে নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে আর্টিলারি বিভাগে ক্যাপেটনরূপে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন এবং সেখানেই জীবন সাংগ করেন। (সরওয়ার মুহাম্মদ, মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, সিন্ধ সাগর, একাডেমী, লাহোর, ১৯৬৭, পৃঃ ৪৫২-৫৩)

৫১-খ. নক্শ-এ-হায়াত (২), ১৭৭

৫২. ঐ ১৭৬

৫৩. রেশমী রুমাল ২১৩-১৪

৫৪. নকশ-এ-হায়াত (২), ১৪৯

৫৫. ঐ ১৭৭-৭৮

৫৬-৫৭. খুতুবাত ৬৯

৫৮-৬০. ঐ ৭০

৬১. উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী প্রণীত রাজনৈতিক কর্মসূচীর সারাংশ দেখুন—
পরিশিষ্ট নং ৮

৬২. খুতুবাত ৭০

৬৩. সরওয়ার, মুহাম্মদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬২

৬৪. 'জমিদার' পত্রিকার নিষেধাজ্ঞাটি ছিল নিম্নরূপঃ
জমিদার, ১৮ মে ১৯২৫
একটি পুস্তিকার প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা
সিমলা ১৫ই মেঃ সামুদ্রিক শুল্কনীতির আওতায় সরকার ভারতে একটি উর্দু পত্রিকা বা এর অনুবাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এই পত্রিকার নাম "ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধীনে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ২য় রূপ "অথবা" কাবুলে কংগ্রেস কমিটির প্রতিষ্ঠা এবং মহাভারত সর্বরাজ্য পার্টির কর্মসূচী।" এই পুস্তিকাটি লিখেছেন উবায়দুল্লাহ ও যফর হাসান। পুস্তিকাটি ইস্তাম্বুলের মাহমুদ-বে প্রেস ১৯২৪ সালে প্রকাশ করেছেন। উক্ত ব্যক্তিদ্বয় হলেন যথাক্রমে কাবুলের কংগ্রেস কমিটির

সভাপতি ও সেক্রেটারি। (সরওয়ার মুহাম্মদ, মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, ১৯৬৭ পৃঃ ৪৬৩)

৬৫. সিয়াসত, ১৮ মে ১৯২৫

কনস্টান্টিনোপলে প্রকাশিত উবায়দুল্লাহ্‌র রচনাবলীর প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা।

সিমলা, ১৫ মেঃ সামুদ্রিক শুল্কনীতির আওতায় ভারত সরকার ভারতে একটি পুস্তিকার প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছেন—পুস্তিকাটি উর্দু ভাষায় হোক বা অন্য কোন ভাষায়ই হোক। পুস্তিকাটির শিরোনাম হলোঃ "কংগ্রেসের অধীনে ভারতীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়" বা "কাবুলে কংগ্রেস কমিটির প্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয় মহারাষ্ট্রের স্বরাজ পার্টির কর্মসূচী"। পুস্তিকাটি কনস্টান্টিনোপলের মাহমুদ-বে প্রেস থেকে ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এতে কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক—উবায়দুল্লাহ্ ও যফর হাসানের দস্তখত রয়েছে। (সরওয়ার মুহাম্মদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬৩)

৬৬. সরওয়ার, মুহাম্মদ, পৃঃ ৪৬২

৬৭. ঐ ৪৬৪

৬৮. খুতুবাত ৭০-৭১

৬৯-৭০. ঐ ৭১

৭১. ঐ ৭২

৭২. ঐ ৭২-৭৩

৭৩. ঐ ৭৮

৭৪. Rowlatt Sedition Committee Report, chapter XIV, 1918 p. 125

৭৫. খুতুবাত ৮১

৭৬. ঐ ৭৩, ৮০

৭৭. ঐ ৫৫

৭৮-৭৯. ঐ ৭৪

৮০-৮১. দৈনিক আজাদ, কলিকাতা, ফালগুন ২৪, ১৩৪৫/মার্চ ৮, ১৯৩৯

৮২-৮৩. খুতুবাত ৮৫-৮৬

৮৪. ঐ ৮৮

৮৫. ঐ ৯৪

৮৬. খুতুবাত ১৭৭-৭৮

৮৭. বেদান্তঃ ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপক শাস্ত্র। বেদের শেষ ভাগ তথা উপনিষদকে বেদান্ত বলে। এতে বেদের সারবস্তু আছে বলে এর নাম বেদান্ত। বেদান্তের ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা বাদরায়ণ (বেদব্যাস)। অনেকের মতে উপনিষদ বেদজ্ঞগণের নিষ্কাশিত সার, তাই তা বেদান্ত। শঙ্করাচার্য (আবিঃ আনু. ৮০০) তাঁর 'শারীরক ভাষ্য' নামক বিখ্যাত বেদান্ত ভাষ্যে তিনি যে মতবাদ প্রকাশ করেন, তা হিন্দু চিন্তাধারায় গভীরভাবে রেখাপাত করে। এই অভিমতে ব্রহ্ম বিশ্বস্রষ্টা এবং একাধারে

অতীন্দ্রিয় ও সর্বপরিব্যাপ্ত। শঙ্কর একত্ববাদের সমর্থক। শঙ্করের প্রায় ২০০ বছর পর রামানুজ (আনু. ১০১৭) বেদান্ত দর্শন সম্পর্কে দ্বৈতবাদভিত্তিক ভাষ্য প্রচার করেন। তাঁর দ্বৈতবাদ সর্বাঙ্গীন বা পরিপূর্ণ ছিল না। মাধ্যবাচার্য (আনু. ১১৯৯) বেদান্তের পরিপূর্ণ দ্বৈতবাদভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন অর্থাৎ তাঁর মতে বস্তু ও আত্মা (matter & spirit) পৃথক সত্তাবিশিষ্ট। (বাংলা বিশ্বকোষ (৩), ঢাকা ১৯৭৩, পৃঃ ৪৯৭

৮৮. খুতুবাত ১৭৯
৮৯. ঐ ১৭৯-১৮৪
৯০. ঐ ১৮২-৮৩
৯১. ঐ ১৮৬-১৮৮
৯২. ঐ ১০৮
৯৩. ঐ ১১০
৯৪. ঐ ১১১
৯৫. ঐ ১১১-১১২
৯৬. ঐ ১১২-১১৩
৯৭. ঐ ১১৩-১১৪
৯৮. ঐ ১১৪-১১৫
৯৯. ঐ ১১৬-১১৭
১০০-১০১. ঐ ১১৭
১০২. ঐ ১১৮
১০৩. ঐ ১২০
১০৪. ঐ ১২১
১০৫-১০৬. ঐ ১২২-১২৩
১০৭-১০৮. ঐ ১২৩
১০৯. ঐ ১২৪-১২৫
১১০. ঐ ১৯৮-২০০
১১১. ঐ ২০২
১১২. ঐ ২০৩
১১৩. ঐ ২০৪-২০৬
১১৪. ঐ ২০৬-২০৭
১১৫. ঐ ২০৭-২০৮
১১৬. ঐ ২১২-২১৩
১১৭. ঐ ২১৫
১১৮. ঐ ১৩৪
১১৯. ঐ ১৩৮

১২০. ঐ ১৪১
১২১. ঐ ১৫১-১৫৬
১২২. ঐ ১৫৭-১৫৯
১২৩. ঐ১৬৩-১৬৪
১২৪. ঐ ১৬৫
১২৫. ঐ ১৬৭-১৬৮
১২৬. ঐ ১৭২-৭৩
১২৭. দায়েরা-এ-মাআরিফ-এ-ইসলামিয়াহ্ (১২), লাহোর, ১৯৭৩, পৃঃ ৯৮৫
১২৮. Star of India, August 25, 1944

অধ্যায় তিন

রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা

ছোটবেলাতেই সিন্ধীর মনে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। তিনি 'আত্মকথায়' (যাতী ডায়েরী ১৯৪৪) বলেছেন, ছোটবেলায় নিজ পরিবারের বৃদ্ধাদের মুখে পাঞ্জাব বিপ্লব (শিখ-বৃটিশ যুদ্ধ ১৮৪৬ ও ১৮৪৯)-এর বেদনাদায়ক কাহিনী শুনে এমনিতেই তাঁর মন ছিল বিষায়িত। তদুপরি কৈশোরে ইসলামী সাহিত্যচর্চা করতে গিয়ে ইসমাঈল শহীদের জিহাদমুখর জীবনী পড়ে এবং পরবর্তী সময় দেওবন্দের ছাত্রজীবনে সেখানকার শিক্ষক আবদুল করীম দেওবন্দীর নিকট তাঁর স্বচক্ষে দেখা দিল্লীর পতনের (১৮৫৭) ইতিহাস জেনে তাঁর রাজনৈতিক অনুভূতি আরো শানিত হয়ে উঠে। তিনি ইসমাঈল শহীদের জিহাদ সংক্রান্ত কিছুটা লেখার মর্মানুসারে নিজের রাজনৈতিক তথা জিহাদ বিষয়ক কর্মসূচী প্রণয়ন করেন।[১] তাঁর এই জিহাদ-ভাবাপন্ন হওয়ার মানে ছিল—রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হওয়া। কারণ তাঁর ঐ জিহাদের উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভূমিকে বৃটিশের-কব্জা থেকে মুক্ত করা। তিনি যখন আনুষ্ঠানিক শিক্ষাশেষে তাঁর মুর্শিদের খলীফা আবুল হাসান তাজ মাহমূদের নিকট ইমরোটে (শুক্কুর) শিক্ষাদান-রত ছিলেন, তখন চারজন মুজাহিদের একটি দল গঠন করেছিলেন এবং নিজেই দলের আমীর ছিলেন। তাঁর ভাষায়, "আমি ইমরোটে চারজন ছাত্রের একটি দল গঠন করি। এর উদ্দেশ্য ছিল জিহাদ করা। আমি ঐ দলের দলপতি ছিলাম। ঐ দলটি ইসমাঈল শহীদের যুদ্ধাদর্শে গঠন করা হয়েছিল। আমি ঐ দলের সূত্র ধরে জিহাদের কাজ শুরু করি।"[২]

দেওবন্দ মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে সিন্ধী তাঁর উস্তাদ মাহমূদুল হাসানের সাহচর্য ও তাঁর বিপ্লবের কর্মসূচীতে প্রভাবান্বিত হন। দেওবন্দ মাদ্রাসায়

ছাত্র-শিক্ষক নিয়ে বৃটিশ বিরোধী ও সংগ্রামী রাজনীতি আরম্ভ করেছিলেন তো তিনি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের আদেশে সেখান থেকে বিতাড়িত হন।[৩] অতুল আন্‌সার' ছিল প্রকারান্তরে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এ সেক্রেটারিরূপে পরোক্ষভাবে রাজনীতিই করেছিলেন। তাঁর ভা "আমি যখন সিন্ধু থেকে দেওবন্দ্ গেলাম এবং 'জমীঅতুল-আন্‌সা কাজ শুরু করলাম, তখন আমার সামনে ছিল শায়খুল হিন্দের আদেশ।"[৪] 'জমীঅতুল আন্‌সার'-এর অন্যতম সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য মাহমূদুল হাসান- পরিকল্পিত বৃটিশ উৎখাতের অভিযান পরিচ জন্য একটি ছদ্মবেশী বাহিনী গড়ে তোলা। তাই স্বভাবতই বলা সিন্ধীও বৃটিশ উৎখাতের পরিকল্পনায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন এ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি কাবুল গমন করেন।

দেওবন্দের আলিমগণ গোড়া থেকেই প্যান-ইসলামবাদে বিশ্বাসী ছি মুসলিম দুনিয়ার প্রতিনিধিরূপে তুরস্ক-খলীফার প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধ ছিল। সিন্ধীও প্রথম জীবনে প্যান-ইসলামী চেতনায় অনুপ্রাণিত ছিলেন ঐ প্রেরণা নিয়েই কাবুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু কামাল পাশা কর্তৃক খি রহিত করার পর তিনি প্যান-ইসলামবাদ ত্যাগ করে জাতীয়তাবাদে হন।[৫] তিনি বলেনঃ "পুরনো তুরস্ক পরাজিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়ে নব্য তুরস্কের পক্ষে খিলাফত সামলানো মুশকিল ছিল। সেই দেশটি খিলাফত রহিত করে ইউরোপের আদর্শে জাতীয় সরকার গঠন ক এবং নিজ দেশের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগে করেছে।[৬] এক সময় বৃটিশবিরোধী শক্তিগুলোর সাথে জড়িত ছিলাম। তখন ধর্মীয় দৃষ্টি নিয়ে আমি প্যান-ইসলামবাদকে ফরয বলে মনে করতাম। আমরা সেই পরাজিত হয়েছি। তখনকার ধর্মীয় সিদ্ধান্তকে আমি এখনো সঠিক মনে করি। কিন্তু আজ পরিস্থিতি পালটে গেছে। এখন বৃটিশের মুসলমানের কোন ধর্মযুদ্ধ নেই।[৭]

সিন্ধী কাবুল গিয়ে আফগান সরকারকে বৃটিশ বিরোধী করে তে কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তুর্কী-জার্মান মিশনের সাথে কাবুলাগত নীতিক রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও বরকতুল্লাহ্ গঠিত অস্থায়ী ভারত সরক সদস্য হয়ে তিনি আফগান সরকারের কর্মকর্তাদের এবং শীর্ষস্থানীয় দেরকে অনেকটা বৃটিশবিরোধী করে তুলতে সক্ষম হন। আফগানিস্ত

অধিবাসীরা স্বভাবতই ধর্মভীরু ছিলেন। তুরস্কের খিলাফতের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তাই তাঁরা ছিলেন তুর্কীপন্থী। খলীফার দেশ তুরস্ককে আক্রান্ত দেখে তাঁরা মর্মাহত হন। অন্যদিকে আমীর হাবীবুল্লাহ্‌র বৃটিশপ্রীতির দরুন আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব চলে গিয়েছিল ভারতীয় বৃটিশ গভর্নমেন্টের মুঠোয়। এ দিক থেকেও আমীর হাবীবুল্লাহ্‌র প্রতি বেশীর ভাগ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা ও দেশবাসী অসন্তুষ্ট ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে তুর্কী জার্মান মিশন, বিশেষত উবায়দুল্লাহ্‌ সিন্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতীয় মুজাহিদদের বৃটিশ বিরোধী প্রপ্যাগাণ্ডার ফলে সোনায় সোহাগা হয়। বৃটিশের বিরুদ্ধে এঁরা জিহাদের যে প্রচারণা চালান, তাতে সরকার বিরোধী আফগান কর্মকর্তা এবং খিলাফতপন্থী গোঁড়া মুসলমানদের মনে বৃটিশবিরোধী জিহাদী মনোভাব আরো তীব্র আকার ধারণ করে। আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে তুরস্ক বাহিনী কর্তৃক বৃটিশ ভারত আক্রমণ করার যে পরিকল্পনা মাহমূদুল হাসান করেছিলেন, কাবুলে সমবেত ভারতীয় মুজাহিদদের সহযোগিতায় সেটাকে বাস্তবায়িত করা এবং তদনুযায়ী আফগান সরকারকে রাযী করানোর জন্য সিন্ধী যারপরনাই চেষ্টা করেন। কিন্তু কাবুলের শাসনকর্তা আমীর হাবীবুল্লাহ্‌ খানের বৃটিশ-প্রীতি, তাঁর নিরপেক্ষতা ঘোষণা, মতান্তরে তাঁর চরবৃত্তির দরুন ঐ পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়। ফলে বৃটিশ গভর্নমেন্টের ইংগিতে ও আমীর হাবীবুল্লাহ্‌র আদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের দায়ে ভারতের অন্যান্য নেতাদের সাথে মওলানা সিন্ধীও কালে এক বছর আট মাস কারাবরণ করেন। আমীর হাবীবুল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর আমীর আমানুল্লাহ্‌ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সিন্ধী মুক্তি লাভ করেন। তিনি তৃতীয় ঈংগ-আফগান যুদ্ধের সময় আমীর আমানুল্লাহ্‌র সহায়তা করেন এবং যুদ্ধশেষেও প্রশাসনিক কাজে তাঁকে গঠনমূলক পরামর্শ দিয়ে সেবাসুলভ মনোভাব ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেন।

সিন্ধী আফগান সরকারের হিত সাধন করেছেন, ভাল কথা। কিন্তু তিনি যে মিশনটি নিয়ে তথায় গিয়েছিলেন, সেটা তো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। এখানে তাঁর প্রজ্ঞা হলো এই যে, তিনি ঐ ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিতে কসুর করেন নি। এই ব্যর্থতার পরেও দেওবন্দের আলিম সমাজ বৃটিশ আনীত আধুনিকতার পথে অগ্রসর হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করেন নি; আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি দেশবাসীকে উৎসাহিত করেন নি; প্যান-ইসলামবাদও ত্যাগ করেন নি। কিন্তু সেই স্কুলের ছাত্র হয়েও সিন্ধী গভীরভাবে উপলব্ধি

করলেন যে, বৃটিশের ন্যায় মহান শক্তি'র সাথে সম্মুখ জিহাদ করে নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা যাবে না; তুরস্ক বা আফগানিস্তান বা অন্য কোন দেশের উপর তোয়াক্কা করে বৃটিশের সাথে যুদ্ধ করার ঝুঁকি নেওয়া মোটেই সমীচীন হবে না। বরং বৃটিশের সাথে আপাতত সহযোগিতা করে এবং ইউরোপ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করে নিজেদের প্রস্তুত করে নিতে হবে এবং যথা-সময় দেশের অভ্যন্তরীণ শক্তি নিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার অভিযান চালাতে হবে। একবার ঢাকার নওয়াব শামসুদদৌলাহ (১৭৭০-১৮৩২) অযোধ্যার শাসনকর্তা ওযীর আলী খান, কাবুলের অধিপতি যামান শাহ্ এবং ইরান ও ফরাসী সরকারের সাথে আঁতাত করে ইংরেজ শাসন উৎখাতের একটা নীলনকশা এঁকেছিলেন (১৭৯৬-৯৮)। তাঁর ঐ নীলনকশা প্রস্তুতির কাজ শুরু হয় মুর্শিদাবাদে। তিনি পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণ করেন ঢাকায়। জাহাজযোগে বংগদেশ আক্রমণ করার জন্য তিনি মাসকটের আরবদের সংগেও যোগা-যোগ করেছিলেন এবং তদনুসারে ১৭৯৬-৯৭ সালে আরবদের জাহাজ সশস্ত্র সেনাবাহিনী ও সামরিক সাজসরঞ্জাম নিয়ে কলকাতা বরাবর বংগোপ-সাগরে এসে নোংগর করেছিল। জাহাজে অবস্থানরত সেনাপতিরা নওয়াব শামসুদ্দৌলার নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ঐ নীলনকশা ফাঁস হয়ে পড়ে এবং ১৭৯৯ সালে নওয়াব শামসুদ্দৌলাহ ষড়যন্ত্র ও বিদ্রো-হের অভিযোগে সভাকবি মির্যা জান তাপিশ ও সভাসদ নান্‌কু মিঞাসহ ইংরেজ সরকারের হাতে বন্দী হন এবং কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে সাত বছর (১৭৯৯-১৮০৬) কারাবরণ করেন। মওলানা মাহমূদুল হাসান ও মওলানা সিন্ধীর পরিকল্পনাও কতেকটা ঐরূপ ছিল। পরিকল্পনা ফাঁস হওয়ায় এঁদেরকে কারাবরণ করতে হয়। মওলানা মাহমূদ ও মওলানা সিন্ধীসহ ভারতের বিপ্লবী দল তুরস্কের সাহায্যের উপর ভর করে তাঁদের পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর মওলানা সিন্ধীর মনে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পরাশক্তির আশা করা যে কতটা অসংগত, সেটা তিনি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেন। তখন থেকেই তাঁর মনে স্বাবলম্বনের চিন্তা উদিত হয় এবং তিনি দেশে ফিরে বারবার দেশবাসীকে এ মর্মে সতর্ক করে দেন যে, স্বাধীনতা আন্দোলন নিজ বাহুবলেই করতে হবে; কোন বিদে-শের মুখপানে চাওয়া হবে নিরর্থক। স্বাধীনতার জন্য বারবার ছোটখাট যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে বৃহত্তর অভিযানের প্রস্তুতি নিতে হবে। তাঁর ভাষায় বলতে গেলেঃ "ভারতীয়দের উচিত, বহির্দেশীয় মুসলমানদের কোন বিব্রতকর

কর্মসূচীতে জড়িত না হওয়া। তাদের কর্তব্য হলো নিজ দেশের উপর আধিপত্য স্থাপনের জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। যদি এ পথে একশ' বছরও লেগে যায়, তথাপি কর্মসূচীতে পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই।[৮] আমার মতে, ভারতবাসীদের জন্য কংগ্রেসের অহিংস নীতি অতদিনই মেনে চলা প্রয়োজন, যতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ করে স্বদেশ জয় করতে পারবে বলে তাদের বিশ্বাস অর্জিত না হয়। এই নীতি প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। দৃঢ়ভাবে এটা পালন করা উচিত। যতদিন তারা শেষ সুযোগের জন্য প্রস্তুত না হবে, ততদিন ছোটখাট লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া মোটেই সমীচীন হবে না।"[৯]

১৯১৬ সালে শরীফ হুসাইন আরব জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে হিজাযে তুরস্ক থেকে বিচ্ছিন্ন একটি স্বাধীন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তুরস্কের জাতীয়তাবাদীরা ১৯২০ সালের ২৮শে জানুয়ারি 'মীসাক-এ-দিল্লী'র (National Pact)-এর মধ্য দিয়ে আরব-প্রধান অঞ্চলসমূহের উপর থেকে তাঁদের শাসনাধিকার প্রত্যাহার এবং মুসলমানদের পবিত্র স্থানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব খলীফার হাতে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯২২ সালের নভেম্বরে তুরস্ক তাদের জাতীয় পরিষদে সুলতান-খলীফা ৬ষ্ঠ মুহাম্মদকে পদচ্যুত করে এবং তদস্থলে আবদুল মজীদকে (১৮৬৮-১৯৪৪) সুলতান না করে কেবল খলীফারূপে নির্বাচিত করে—তাঁকে পার্থিব ও প্রশাসনিক ক্ষমতাবিহীন খলীফা বলে ঘোষণা করে। একই সময়ে আংকারার জাতীয় পরিষদ তুরস্ককে প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলে আখ্যায়িত করে। ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ কামালপন্থী গভর্নমেন্ট আইন রচনা করে খিলাফত রহিত করেন। কামাল পাশা দেশ বিজয়ের পরক্ষণেই সমাজ সংস্কারে হাত দেন। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) কর্তৃক সমাজবাদের ভিত্তি রচিত হয়। আমীর আমানুল্লাহ ১৯১৯ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত আফগানিস্তানের বাদশা ছিলেন। তিনিও তাঁর দেশকে আধুনিকায়িত করার চেষ্টা করেন।

সিন্ধী ছিলেন সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক। তিনি আরব ও তুরস্কের জাতীয়তাবাদ প্রত্যক্ষ করেন; রাশিয়ার সমাজবাদে প্রভাবান্বিত হন; কামাল পাশা ও আমীর আমানুল্লাহর সংস্কার-অভিযানে যুগ্ম হন। এসব রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সমাজ সংস্কার সাধনের প্রেক্ষাপটে মওলানা সিন্ধী প্যান-ইসলামবাদ ত্যাগ করেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রকে

তাঁর রাজনীতির মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেন; রাশিয়ার অনুসরণে ভারতে একটি ন্যায়নিষ্ঠ, কৃষক-শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব-বিশিষ্ট ও পুঁজিবাদীদের জুলুমমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। সামরিক শক্তি প্রয়োগে বৃটিশ উৎখাতের পরিকল্পনাও তিনি এ সময়ে পরিত্যাগ করে থাকবেন। এ সময় তিনি জিহাদের মানে প্রত্যক্ষ সামরিক অভিযান—এই ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন যে, এর আরো একটি অর্থ আছে এবং তা হলো মুসলিম বাদশার অবর্তমানে জিহাদ বলতে বোঝায় সমাজ-বিপ্লব। প্যান-ইসলামবাদ সম্পর্কে তিনি বলেনঃ "আনুমানিক তিন বছর আমি তুরস্কে ছিলাম। আমি সেখানে প্যান-ইসলামবাদের ইতিহাস অধ্যয়ন করলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, অদূর ভবিষ্যতে এর কোন কেন্দ্র গড়ে উঠার সম্ভাবনা নেই। তাই আমি তুর্কীদের জাতীয়তাবাদের অনুসরণে আমার ইসলামী আন্দোলনকে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের' আওতাধীন করা জরুরী বলে মনে করলাম এবং এর অধীনে স্বনীতি অনুসারে ভিন্ন একটি পার্টির (সর্বরাজ্য পার্টি) মেনিফেস্টো তথা গঠনতন্ত্র ও উদ্দেশ্যাবলী ছেপে দিলাম।"[১০] কামাল পাশা ও আমানুল্লাহ্ খানের সমাজ সংস্কার সম্পর্কে তিনি বলেনঃ "শায়খুল হিন্দের ঐ বিপ্লব কিভাবে বাস্তবায়িত করা যায়? আমার মতে ইউরোপ (রাশিয়া) থেকে তা শিখতে হবে। আমাদের পুরনো হাতিয়ার (সমাজনীতি) এখন কোন কাজে আসবে না। কামাল পাশা ও আমানুল্লাহ্ খান এ মর্মটি ভালরূপেই অনুধাবন করেছেন। আমিও বিদেশে থেকে এই সত্য ভাল করে বুঝতে পেরেছি। ইউরোপের বিজ্ঞান ও ইউরোপের সামরিক বিদ্যা ইউরোপ থেকেই শিখতে হবে।[১১] রাশিয়ার সমাজ-বিপ্লব এবং জিহাদের দ্বিতীয় অর্থ সম্পর্কে সিন্ধী বলেনঃ"কাবুলে থাকাকালে জিহাদের প্রাথমিক অর্থই ছিল আমার আদর্শ। সেখানে মুসলমান বাদশা ও মুসলমানের সামরিক শক্তি বিদ্যমান থাকায় আমি জিহাদের আদেশ বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করি। অতঃপর পরিস্থিতি বদলে যায়; আমাদেরকে কাবুল ছাড়তে হয়; আমি রাশিয়ায় চলে যাই; রাশিয়ার রাজনীতি অধ্যয়ন করে আমি শায়খুল হিন্দের বাতলানো জিহাদের দ্বিতীয় অর্থের প্রয়োগ বুঝতে সক্ষম হই--তা হলো-- মুসলমানদের শাসনক্ষমতা ও সামরিক শক্তি না থাকলে তখন তাদের কর্তব্য হবে নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের দল গঠন করা ও জিহাদ করা। এই জিহাদকেই ইউরোপে বিপ্লব বলা হয়। ঐ সময় ইউরোপীয় বিপ্লবের প্রাণ-কেন্দ্র ছিল রাশিয়া। সেখানে আমি সাত মাস ছিলাম এবং ইউরোপের বিপ্লব

সম্পর্কে ভাল করে পড়াশোনা করলাম। ঐ অধ্যয়নই আমার চোখ খুলে দিয়েছিল। তখন আমি জিহাদের দ্বিতীয় অর্থ বুঝতে সক্ষম হই।"[১২]

১৯২৪ সালে ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত সিন্ধীর 'সর্বরাজ্য পার্টির' মেনিফেস্টোতে[১৩] তাঁর উক্ত মনোভাব প্রতিফলিত হয়। ঐ মেনিফেস্টোর মর্ম ছিল ঃ ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতা কায়েম করা হবে; সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার থাকবে; মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের স্বার্থ এবং ইসলামের মর্যাদা সংরক্ষণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে; ব্যবস্থাপক সভায় বয়স্ক ভোটের মাধ্যমে সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে; জমিদারি ও পুঁজিবাদ খতম করা হবে; দেশের ভূমি-সম্পদ সরকারের মালিকানাধীন থাকবে; ব্যক্তিগত মালিকানা সীমিত করা হবে; সুদী কারবার বন্ধ করা হবে; ভারত হবে বহু জাতির আবাস-ভূমি; অভিন্ন ভাষাভাষী ও অভিন্ন তহযীব-তমদ্দুনের অধিকারী অঞ্চলগুলো ভিন্ন ভিন্ন স্টেটে পরিণত হবে; স্টেটগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মকে সরকারী ধর্ম বলে পরিগণিত করা হবে; প্রত্যেকটি স্টেট সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন থাকবে; ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে সকল স্টেট থেকে সংখ্যানুপাত এবং আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক গুরুত্বের নিরিখে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হবে; কেন্দ্রের হাতে থাকবে শুধু সামরিক বিভাগ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও পররাষ্ট্রনীতি।[১৪]

তুরস্ক ত্যাগ করে সিন্ধী ১৯২৬ সালে মক্কায় পৌঁছেন। ঐ সময় সেখানে ইবনে সুউদের শাসন চলছিল। সেখানে তিনি ১২ বছর পড়াশোনা ও শিক্ষা-দানে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি হেজায গভর্নমেন্টকে এ মর্মে আশ্বাস দেন যে, তিনি সেখানে কোন রাজনীতি করবেন না। সেটা তাঁর রাজনৈতিক প্র প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে। সুউদী সরকার তাঁকে প্যান-ইসলামবাদী নয়, বরং জাতীয়তাবাদী বলেই ধরে নেন। তাই তাঁর গতিবিধির উপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি।[১৫] ইবনে সুউদ মক্কার শরীফ হুসাইনকে পরাভূত করে হেজাযের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে ভারতের আলিমগণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। লখনৌর মওলানা আবদুল বারীর (১৮৭৮-১৯২৬) নেতৃত্বে ফিরিংগীমহলের আলিমগণ শরীফ হুসাইনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন ক... ন্যদিকে মওলানা মুহাম্মদ আলী ও তাঁর সমর্থকগণ ইবনে ...গত জানান। অবশ্য পরবর্তী সময় মুহাম্মদ আলী রাজতন্ত্র ...ন্য ইবনে সুউদের প্রতি রুষ্ট হন। সিন্ধী সেখানে ছিলেন নির্বাসিত।

তিনি মক্কায় নিশ্চিন্ত চিত্তে শাহ্ ওলীউল্লাহর রচনাবলী ও তৎসংক্র
দেওবন্দী আলিমদের গ্রন্থাবলীর অধ্যয়ন ও সেগুলোর শিক্ষাদানে রত ছিলে
তিনি তথায় ভারতীয় আলিমদের কোন দলেই যোগদান করেন নি। এ
ছিল তাঁর নিরপেক্ষ রাজনীতি।

১৯৩৯ সালে দেশে ফেরার পর সিন্ধীর নব জীবন শুরু হয়। ঐ বছরে
মার্চ থেকে ১৯৪৪ সালের আগস্ট তথা মৃত্যু পর্যন্ত—এই সাড়ে পাঁচ বছরে
রাজনীতি ছিল তাঁর প্রকাশ্য তথা মাঠে-ঘাটের রাজনীতি। দেওবন্দে
রাজনীতি থেকে আরম্ভ করে তাঁর জমীঅতুল আনসার গঠন, সীমা
মুজাহিদ বাহিনীর তত্ত্বাবধান, বৃটিশ শাসন উৎখাতের উদ্দেশ্যে কাবুল গম
এবং সেখানে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন—এ সব ছিল তাঁর গোপ
তৎপরতা তথা গোপন রাজনীতি। তাঁর এ সব কর্মকাণ্ড তাঁর লিখিত আ
কথা (যাতী ডায়েরী) থেকে কতেকটা জানা যায়। বৃটিশের আমলে লে
হয়েছিল বলে তিনি গোপনীয় সব কথা তাতে খোলাখুলি বলেন নি। তি
কিরূপ মুচ্‌লিকা (Bond) দিয়ে বৃটিশ গভর্নমেন্টের নিকট থেকে দেশে ফেরা
অনুমতি পেলেন, তা আজো আমাদের কাছে অজ্ঞাত। অনুমিত হয়, তি
বৃটিশ শাসনের উৎখাত বা বৃটিশ বিতাড়নের আন্দোলন থেকে বির
থাকবেন—এই বণ্ড দিয়েই ভারতে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছিলেন। তাঁ
পরবর্তী ভাষণ, কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ডে তাই প্রতিপন্ন হয়। যে লোকটি এ
সময় ছিলেন বৃটিশ শাসনের দুশমন ও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতীব
সেই মানুষটি ভারতে ফিরে এলেন একজন বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকরূপে
তিনি ইতিপূর্বে শক্তি প্রয়োগ ও জিহাদ করে স্বাধীনতা অর্জনের কথা ভাব
তেন। এখন নীতি দর্শনের আবরণে স্বাধীনতার বাণী শুনাতে লাগলেন
অহিংস নীতি ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ ধরলেন। তিনি জীবনে
শেষ ৫/৬ বছর পরিশ্রম করেছেন যথেষ্ট, সভা-সমিতিতে ভাষণ দিয়েছে
দেদার। তিনি 'বায়তুল হিকমত', 'সিন্ধ্ সাগর একাডেমী' ও 'শাহ্ ওলীউল্লাহ
আবুল কাসেম থিয়লজিক্যাল কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'সর্বরাজ্য পার্টি'র
দ্বিতীয় সংস্করণ-'যমুনা-নর্মদা সিন্ধ্ সাগর পার্টি' নামক রাজনৈতিক দল
প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সাফল্য লাভ করেছিলেন খুবই কম। তাঁর পার্টি'র
জনপ্রিয়তা ছিল খুবই সীমিত। এস. পি. সেন সম্পাদিত 'ডিক্‌শন্যারি অব্
ন্যাশনাল বাইয়গ্র্যাফি'তে বলা হয়েছে ঃ "He failed to carry either the
Muslim Ulema or nationalists with him. Except one or two

occasions, the various political parties and their leaders kept aloof from him."[১৬] নরেশ কুমার জৈন সম্পাদিত 'মুসলিমস্-ইন্-ইণ্ডিয়া'য় বলা হয়েছে: "He was politically isolated."[১৭]

সিন্ধী দেশে ফিরে বৃটিশ শাসনের প্রশংসা করেন, বৃটিশ প্রবর্তিত গনতন্ত্র, ব্যবস্থাপক সভা, ব্যবস্থাপক কাউন্সিল, তাঁদের প্রতিষ্ঠিত কল-কারখানা, রেলপথ ইত্যাদির গুণকীর্তন করেন;[১৮] ইউরোপীয় তহযীব-তমদ্দুনকে স্বাগত জানান;[১৯] ইংরেজী শিক্ষার প্রতি দেশবাসীকে উৎসাহিত করেন। তিনি একদিকে বলতেন, ভারতের জন্য পূর্ণ আযাদী হাসিল করতে হবে,[২০] আবার অন্যদিকে শুনাতেন, বৃটিশ সরকারের সাথে তাঁর দলের কোন দ্বন্দ্ব-কলহ নেই;[২১] ভারতে বৃটিশ শাসন অন্তত আরো ১০।২০ বছর রাখতে হবে;[২২] বৃটিশ কমনওয়েল্থ্-এর অধীনে ভারতের জন্য 'ডমিনিয়ন স্টেটাস' অর্জন করতে হবে—অন্য কথায় তিনি ভারতবাসীদেরকে আরো কিছুকাল বৃটিশ উপনিবেশে থাকার পরামর্শ দেন।[২৩]

সিন্ধী তাঁর আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীন ভারতের রূপরেখা বর্ণনা করে বলেন, অভিন্ন ভাষা ও কাছাকাছি তমদ্দুনের ভিত্তিতে ভারত উপমহাদেশে কয়েকটি স্টেট সৃষ্টি করা হবে এবং সেগুলো ২।৩ টি বিষয় ছাড়া হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ঐ স্টেটসমূহের যৌগিক হবে একটি ফেডারেশন তথা যুক্তরাষ্ট্র। এর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্টেটসমূহ থেকে জনসংখ্যা ও রাজনৈতিক গুরুত্বের ভিত্তিতে কতেক প্রতিনিধি প্রেরিত হবে; কেন্দ্রের হাতে থাকবে শুধু দেশরক্ষা, বহির্বাণিজ্য ও পররাষ্ট্র নীতি। স্টেটগুলোর রাষ্ট্রভাষা হবে স্থানীয় মাতৃভাষা; আর কেন্দ্রীয় ভাষা হবে উর্দু ও ইংরেজী।[২৪]

সিন্ধী ভারতে ফেডারেল গভর্নমেন্ট গঠনের যে স্কীম পেশ করেন, তা তেমন কিছু অভিনব ছিল না। মওলানা মুহাম্মদ আলী ১৯১১ সাল থেকে আমৃত্যু ভারতের জন্য একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনকাঠামো প্রণয়নের অভিমত ব্যক্ত করেন। ১৯১১ সালের ১৪ জানুয়ারী তিনি 'কমরেড' পত্রিকায় লিখেছিলেন, ভারতে হয়তো জাপানের মত একটা কড়া জাতীয় সরকার গঠন করা সম্ভব নয়, তবে কানাডার মত একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা মোটেই কঠিন নয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতে প্রদেশসমূহ ও দেশীয় রাজ্যগুলো নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪২ সালের ২২শে

মার্চ বৃটিশ মন্ত্রীসভার সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স বৃটিশ সরকারের তরফ থেকে শাসন সংস্কারের একটি মিশন নিয়ে ভারতে আসেন। ঐ মিশনের প্রস্তাবেও এই আশ্বাস ছিল যে, যুদ্ধশেষে উপমহাদেশকে ডমিনিয়নের মর্যাদা সম্পন্ন একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করা হবে। সিন্ধীর যুক্তরাষ্ট্র গঠনের স্কীমটির অভিনবত্ব হলো, তিনি অভিন্ন ভাষা ও কাছাকাছি আচার অনুষ্ঠানের অধিকারী অঞ্চলগুলো নিয়ে ভাষা ও তমদ্দুনভিত্তিক স্টেটসমূহ গঠন ও ঐ সব স্টেটের সমন্বয়ে একটি ফেডারেল গভর্নমেন্ট গঠন করতে চেয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্ববর্তী স্কীমগুলোর তুলনায় সিন্ধীর যুক্ত রাষ্ট্রের স্কীমটি ছিল অনেক বেশী স্বব্যাখ্যাত ও অনেক বেশী উদারনীতি তথা গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন। তাঁর এ ধরনের ভাষা ও তমদ্দুনভিত্তিক স্টেট গঠনের প্রস্তাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত ও পাকিস্তানের রাজনীতিতে আজ তাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অভিন্ন ভাষা ও অভিন্ন তমদ্দুনভিত্তিক স্টেট গঠনের দাবি উঠেছে এবং জোরালো আন্দোলনও চলছে।

সিন্ধী কংগ্রেসের সমর্থক হলেও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এর সদস্য ছিলেন না।[২৫] তিনি গান্ধী কংগ্রেসকে মোটেও পছন্দ করতেন না, কারণ তিনি ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী। তিনি মনে করতেন, রাজনীতি-ক্ষেত্রে গান্ধী হিন্দু জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে নয়; তাঁর অভিযোগ ছিল—গান্ধী কংগ্রেসের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করছেন। সিন্ধী যেমন গান্ধী-কংগ্রেসকে পছন্দ করতেন না, তেমনি ধর্মবিহীন সমাজবাদীদেরকেও ভাল জানতেন না। তাঁর ভাষায়ঃ "আপনারা যদি ন্যাশনাল কংগ্রেসে যেতে সংকল্প করে থাকেন, তবে আমার পরামর্শ হলো-আপনারা ভিন্ন একটি দল গঠন করুন। গান্ধীজীর পার্টির অনুসরণ করে আমার মত একজন মুসলমান যেমন সফলকাম হতে পারে না, তেমনি সোশ্যালিস্টদের দলে থেকেও সেই মুসলমান ব্যক্তি তার আন্দোলন সহজে চালাতে সক্ষম হবে না। এ জন্য আপনারা নিজেদের পার্টিকে উৎকৃষ্ট নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করুন, এতে আপনাদের ধর্ম ও পার্থিব অর্থনীতি-উভয়ের সমন্বয় সাধিত হবে।"[২৬]

সিন্ধী মনে করতেন, ধর্মনিরপেক্ষ স্টেটসমূহে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই সমভাবে নাগরিক অধিকার লাভ করবে এবং স্ব-স্ব মর্জি মাফিক স্বাধীনভাবে স্ব-স্ব

ধর্ম পালন করবে। তিনি 'গান্ধী-কংগ্রেস' পছন্দ করতেন না বলেই কংগ্রেসের আওতায় "যমুনা-নর্মদা সিন্ধ্‌সাগর পার্টি" গঠন করেছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক রাজনীতির উপর ঐ পার্টির কোন প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। ঐ দল জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয় নি, যদিও সেই কর্মসূচী জোরালোভাবে চলছে বলে সিন্ধী বারংবার দাবি করতেন।[২৭] বস্তুত ওটি ছিল একটি কাগুজে পার্টি। সিন্ধী স্বয়ং কংগ্রেসী হয়েও মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীকে (১৮৭৮-১৯৫৭) তাঁর পরস্পর বিরোধী মতবাদের জন্য অভিযুক্ত করেন। কারণ মওলানা মাদানী একদিকে জাতীয়তাবাদ সমর্থন করতেন, আবার অন্যদিকে তিনি ছিলেন প্যান-ইসলামবাদী। সিন্ধীর মতে, যে ব্যক্তি ভারতীয় জাতীয়তাবাদ করবে, সে নিজ দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে অপরাপর দেশের মংগল সাধনে ব্রতী হতে পারে না। গান্ধীর তাবেদারি করেন বলেই সিন্ধী মওলানা আবুল কালাম ও মওলানা মাদানী-উভয়েরই সমালোচনা করেন।[২৮]

সিন্ধী কংগ্রেসপন্থী হলেও তিনি কংগ্রেসের সমালোচনা করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি অভিযোগের সুরে বলেছিলেন, কংগ্রেস যদি সংখ্যানুপাতে মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার দিতো, তবে তারা কংগ্রেস থেকে এত দূরে সরে যেতো না। তিনি আরো বলতেন, খিলাফত আন্দোলন ও অন্যান্য স্বাধীনতা-আন্দোলনে মুসলমানদের যোগদান করা সত্ত্বেও কংগ্রেসপন্থীরা স্বরাজ আন্দোলন কেবল একা নিজেরাই করতে চান।[২৯] এই সমালোচনা সত্ত্বেও সিন্ধী কংগ্রেস ত্যাগ করেন নি; পাকিস্তান প্রস্তাবও সমর্থন করেন নি। তিনি কংগ্রেসকে সংশোধিত করে মুসলমান নেতৃবৃন্দকে, এমন কি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকেও সেই দলে নেয়ার কথা ভেবেছিলেন।[৩০] তিনি সমাজবাদের ক্ষেত্রে এবং জগত ও জীবনের প্রশ্নে দেওবন্দ স্কুলের ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হন, কিন্তু ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ও অখণ্ড ভারতের প্রশ্নে সেই স্কুলের গণ্ডিতেই রয়ে গেলেন।

বৃটিশ শাসনকে ভারতে আরো কিছুকাল জিইয়ে রাখা, ভারতকে বৃটিশ উপনিবেশের মর্যাদা দেওয়া, বৃটিশের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হওয়া,[৩১] অহিংস নীতি অবলম্বন করে বৃটিশ কমনওয়েল্‌থে থাকা।[৩২] সিন্ধীর এ সব অভিপ্রায় ও অভিব্যক্তি বিস্ময়কর বলে মনে হয়। ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগ লাহোরে সার্বভৌম মুসলিম স্টেট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব

গ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট কংগ্রেসের বোম্বে-অধিবেশনে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাবার উদ্দেশ্যে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও সিন্ধী কিভাবে পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন,[৩৩] ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বৃটিশ শাসনকর্তাদের পাশাপাশি স্টেটসমূহের প্রতিনিধিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিলেন,[৩৪] দেশরক্ষা বিভাগে বৃটিশ অফিসার বহাল রাখার পরামর্শ দিলেন,[৩৫] বৃটিশ উপনিবেশে বৃটিশ জাতির সাথে সহঅবস্থানের কথা ভাবলেন,[৩৬] বৃটিশ কমনওয়েল্‌থে উৎকৃষ্ট স্থান দখলের উদ্দেশ্যে আরো দশ-বিশ বছর শান্ত জীবন যাপনের আরজু করেছিলেন--[৩৭] তাঁর এ মনোভাব অনুধাবন করা আজ দুরূহ ব্যাপার। পূর্বেই বলা হয়েছে, যতটুকু মনে হয়, দেশে ফেরার সময় তিনি বৃটিশ শাসন উৎখাত না করার অংগীকার করে এসেছিলেন। তাই মনে হয়, ঐকান্তিক অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও তিনি ইংরেজ বিতাড়নের প্রশ্নটি জাতির সামনে উপস্থাপিত করতে পারেন নি। তবে পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যে তাঁর মনে সব সময় পীড়া দিতো, তা অবশ্যই অনুমান করা যায়। একবার তিনি বলেছিলেন ঃ "কোন জাতি দেশের বাইরে বসে আমাদের শাসন করবে--এত অবমাননা তো কোন দিন আমাদের দেশের হয় নি। কিন্তু যখন দিল্লীর উপর বৃটিশের কব্জা হলো, তখন থেকেই আমাদের দেশের 'নূরানী চেহারা'র উপর দাসত্বের কালিমা লেপন করা হয়েছে।"[৩৮] ভারতের স্বাধীনতার ধ্যান সিন্ধী কখনো তাঁর মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন নি। তিনি সব সময় নগ্নশির থাকতেন। মওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী একদিন দিল্লীর জামে মসজিদের দক্ষিণ দরজার পার্শ্বে মওলানা সিন্ধীর সাথে দাঁড়ানো ছিলেন। মওলানা সাঈদ সিন্ধীকে জিজ্ঞেস করে বসলেন ঃ "মওলানা, আপনি সব সময় নগ্নশির থাকেন কেন?" সিন্ধী তৎক্ষণাৎ লালকিল্লার দিকে ইঙ্গিত করে কিছুটা রোষ সহকারে, আর কিছুটা দুঃখের সুরে বললেন ঃ "আমার টুপি তো ঐ দিনই মাথা থেকে খসে পড়েছে, যেদিন এই লালকিল্লা আমাদের হাত থেকে ছুটে গেছে। যতদিন আমি ঐ টুপি ফিরে না পাই, ততদিন আমার ঈর্ষা আমাকে টুপি মাথায় লাগাবার অনুমতি দেবে না।"[৩৯] সিন্ধীর মিশন ও কর্মকাণ্ড কেন জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হলো না, তার কারণ ব্যাখ্যা করে সাঈদ আহমদ বলেন ঃ "এর দু'টি কারণ রয়েছে ঃ প্রথমত মওলানা যত বড় চিন্তাবিদ ও যতটা আন্তরিক ছিলেন, ততটা বাগ্মী ও সাহিত্যিক ছিলেন না

দ্বিতীয়ত তিনি তাঁর চিন্তাচেতনায় ততটা পাকাপোক্তও ছিলেন না। ফলে কোন বিষয় আলোচনা করার সময় তাঁর বাণীভংগি কিছুটা কর্কশ ও শ্রুতিকটু হয়ে পড়তো।"[৪০]

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সিন্ধী কামনা করতেন যে, ইউরোপ তথা রাশিয়ার সমাজবাদ ভারতেও প্রবর্তিত হোক। তবে তাঁর ঐ সমাজ-বাদ ধর্মবিবর্জিত ছিল না। তিনি ধর্মের মূলনীতি ঠিক রেখে সমাজ বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, পুঁজিবাদ সামাজিক উন্নতির পরিপন্থী; তাঁর মতে, কুরআনের শিক্ষায় পুঁজিবাদের কোন স্থান নেই।[৪১] তাই তিনি পুঁজিবাদের অবসান চেয়েছিলেন। তুরস্ক থেকে তিনি তাঁর 'সর্বরাজ্য দলের' যে গঠনতন্ত্র প্রকাশ করেছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন, তাঁর আদর্শ হলো সমাজে জমিদারি থাকবে না; ভূমি থাকবে সরকারের মালিকানায়। অথচ তিনি দেশে ফিরে জমিদারি উচ্ছেদের প্রস্তাব ভুলে গেলেন। তিনি প্রচার করতে লাগলেন, জমিদার ও কৃষকের মধ্যে কোন সংঘাত থাকবে না; কৃষকরা জমিদারদের প্রাপ্য অংশ পুরোপুরি শোধ করবে; জমিদারেরাও কৃষকদের মংগলের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং সরকারের ন্যায্য অংশ সরকারের হাতে পৌঁছাবে। তাঁর ভাষায় বলতে গেলেঃ "আমরা কৃষকদের জন্য সব কিছু চাই। কিন্তু তাদেরকে দিয়ে জমিদারদের সাথে লড়াই করাতে চাই না। বর্তমানে আমাদের দেশে জমিদারদের একটা মর্যাদা আছে। তাঁরা জমিনের খাজনা কৃষক থেকে আদায় করেন এবং সরকারের হাতে তুলে দেন। আমরা যেহেতু সরকারের সাথে লড়ছি না, তাই কৃষকদেরকে জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াবো কেন? আমরা জানি, কিভাবে ব্যবস্থাপক পরি-ষদে জমিদারদের নিকট থেকে কৃষকদের অধিকার আদায় করতে হয়।"[৪২]

সিন্ধীর সমাজ-বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল সমাজের অর্থনৈতিক মুক্তি। তিনি ভাবতেন, এই মুক্তির জন্য ইউরোপের শিল্প বিপ্লব ভারতে অবশ্যই ঘটাতে হবে। তিনি বলতেন, এই বিপ্লবের সন্ধান তিনি খুঁজে পেয়েছেন শাহ্ ওলীউল্লাহ্র দর্শনে। অন্য কথায়, তিনি ইউরোপের অর্থনৈতিক বিপ্লবে শাহ্ ওলীউল্লাহর সমাজ-চিন্তার সঠিক ব্যাখ্যা লক্ষ্য করেছেন। তিনি কৃষক, মজুর, তথা খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি বলতেন, ভারতের কৃষক-শ্রমিকদের জীবন পদ্ধতির মান ইউরোপের কৃষক-শ্রমিকদের তুলনায় অধম হওয়া উচিত নয়। তাঁর ভরসা ছিল তরুণদের

উপর। তাঁর বিশ্বাস ছিল, তরুণরা চেষ্টা করলে ভারতে শিল্প বিপ্লব অবশ্যই ত্বরান্বিত হবে।

লক্ষণীয় হলো---সিন্ধীর চিন্তা ও কর্ম সমতালে চলে নি। তাঁর চিন্তা যতটা অগ্রমুখী ছিল, তাঁর কর্ম ততটা অগ্রণী ছিল না। তিনি শিল্প-বিপ্লব চেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তার জন্য পথনির্দেশ দিতে পারেন নি। শিল্প-বিপ্লবের জন্য যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন, সেই ব্যবস্থার কথা তিনি ভাবেন নি। তিনি 'বায়তুল হিকমত' প্রতিষ্ঠা করে সেখানে শাহ্ ওলীউল্লাহ্-দর্শন শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তিনি কোন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার চেষ্টা করেন নি। 'জমী অতুল্-আবসার'-এর সেক্রেটারি থাকাকালে তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসা ও আলীগড় কলেজ তথা সনাতন শিক্ষাপ্রাপ্ত ও আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে একটা সেতুবন্ধ সৃষ্টির কর্মসূচী নিয়েছিলেন। কিন্তু তা-ও অগ্রসর হয় নি। তিনি ছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষিত। তাই স্বভাবতই তাঁর আনাগোনা বেশী ছিল মাদ্রাসা-শিক্ষিত লোকদের মধ্যে। তিনি মাদ্রাসা সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েমের দিকে তাঁর দৃষ্টি যায় নি। মোটকথা, তাঁর সমাজচিন্তা যতটা আধুনিক ছিল, তাঁর কর্ম ততটা আধুনিক ছিল না।

মওলানা সিন্ধীর রাজনৈতিক কলা-কৌশল ও ভাবধারা সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্রু বলেন ঃ

"ইতালীতে কিয়ৎকালের জন্য মৌলবী ওবেইদুল্লার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। তিনি চালাক-চতুর এবং প্রাচীন ধরনের রাজনৈতিক কলা-কৌশলে সুপটু; কিন্তু আধুনিক ভাবধারার সহিত তাঁহার কোন পরিচয় নাই। তিনি আমাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের (ইউনাইটেড রিপাবলিক্স অব ইণ্ডিয়া) একটা পরিকল্পনা দেখাইয়া বলিলেন, ইহা দ্বারাই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। তিনি আমাকে ইস্তাম্বুলে (কনস্টান্টিনোপল) তাঁহার অতীত কার্যকলাপের কথা বলিলেন। আমার নিকট সেগুলি গুরুতর বলিয়া মনে হয় নাই এবং সেগুলি আমি অল্পকাল পরেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কয়েক মাস পরেই লালাজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তাঁহার নিকটও তিনি এসব গল্প করেন। লালাজী তাঁহার কথায় অত্যন্ত মুগ্ধ হন। সেই সকল গল্পই নানা অযৌক্তিক ও আশ্চর্যরাগে

প্রভাবিত হইয়া সেই বৎসর ভারতীয় আইন সভার নির্বাচনে ব্যবহৃত হইয়াছিল। পরে মৌলবী ওবেইদুল্লা হেজাযে যান। তাহার পর আর কয়েক বৎসর আমি তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই।[১]

মুঈন শাকির মওলানা সিন্ধীর রাজনৈতিক দর্শন ও ইসলাম-সমর্থিত তাঁর মৌলিক সমাজ-চিন্তা ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ

"It was Ubaidullah Sindhi (1872-1944), trained by Mahmud-ul-Hassan, who evolved a political philosophy which, on the one hand was influenced by the revolutionary traditions of Wahabies, on the other, by the "Indo-Islamic," joint programme of Mahmud-ul-Hassan. He was the first Indian Muslim to adopt the national point of view in the interpretation of the history of the Islamic. But to Moulana Sindhi it was Islamic as well as humanist, This historical approach is the culmination of the revolutionary teachings of Shah Waliullah ··· Sindhi's theory of nationalism was different from that of the Congress and the reactionary Ulema. A real federation would provide a true solution of the Indian problem......Moulana Sindhi is the most original and progressive thinker of modern India. After Shah Waliullah and Sir Syed, he made a sincere attempt to interpret Islam in accordance with the requirements of the age. He visualized the possible impact of Islam on the social, political and economic life of tho people... He supported the establishment of a democratic socialist state and society. This is characterised by zizA Ahmad as a kind of "Pseudo-Waliullahi communism". Moulana Sindhi, curiously enough, is one of the most neglected thinker of Islam. He is condemned without being studied and understood. His concept of religion, nationalism and nationalities and Islamic communism is an original Contribution to Musllm Political ideas in India."

(Moin Shakir, Khilafat to Partition. Delhi, 1983, pp. 43, 45 & 46

---

১. জওহরলাল নেহরু ঃ আত্ম-চরিত (সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-অনূদিত), প্রকাশক ঃ অশোককুমার সরকার, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, ১৩৭১, পৃঃ ১২২।

তথ্যনির্দেশ

১. খুতুবাত ৬৫
২. ঐ ১৫৪
৩. Roulatt Sedition Committee Report, 1918, Chapter XIV, Pp. 125-127
৪. খুতুবাত ১৫১
৫. উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মাহমুদিয়া, মাক্‌তাবা-এ-বায়তুল হিকমত, লাহোর, ১৯৪৫, বশীর আহমদ লিখিত ভূমিকা, পৃঃ ৯
৬. খুতুবাত ১১৪
৭. ঐ ১১৮
৮. ঐ ২০৩
৯. ঐ ২০৪
১০. ঐ ৭০
১১. ঐ ১৫৫-১৫৬
১২. ঐ ১৫১-১৫২
১৩. মনিফেস্টোটি দেখুন পরিশিষ্ট নং ১
১৪. সরওয়ার মুহম্মদ, পৃঃ ৪৫২-৪৫৯
১৫. খুতুবাত ৭১
১৬. S. P. Sen (ed), Dictionary of National Biography, Vol III, Institute of Historical Studies, Calcutta, 1974, p. 278
১৭. Naresh Kumer. Jain (ed), Muslims in India, A Biographical Dictionary (II), Delhi, 1979, p. 198
১৮. খুতুবাত ১০৯-১১০
১৯. ঐ ৮৮-৮৯, ১৮২
২০. ঐ ১৮১
২১. ঐ ২০৬
২২. ঐ ১৭২
২৩. ঐ ১৬৩
২৪. ঐ ১৮০
২৫. ঐ ১০১
২৬. ঐ ১৩৮
২৭. ঐ ১০২
২৮. ঐ ১৫২
২৯. ঐ ১১৬
৩০. ঐ ১২২-২৪

৩১. ঐ ১৬৩
৩২. ঐ ১১৮
৩৩. ঐ ১৩১
৩৪-৩৫. ঐ ১৪০
৩৬. ঐ ১৫৬
৩৭. ঐ ১৭২
৩৮. ঐ ১০৫
৩৯. আবদুর রশীদ আরশাদ. বীস্ বড়ে মুসলমান, দেওবন্দ, ১৯৭০, পৃঃ ৪১১
৪০. ঐ ৪১২
৪১. খুতুবাত ২০২
৪২. ঐ ১৫৭

অধ্যায় চার

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভাবধারা

মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ছিলেন শিখ-ধর্মান্তরিত মুসলমান; তাঁর পিতা ছিলেন হিন্দুধর্ম থেকে শিখধর্মে দীক্ষিত। ইসলাম সত্যিকার অর্থে 'তওহীদ' (আল্লাহ্‌র একত্ববাদ)-এর শিক্ষা দেয় বলেই সিন্ধী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। ইসলাম গ্রহণের পরেও তাঁর সূফীতাত্ত্বিক চিন্তাধারায় হিন্দুধর্মের বেদান্তবাদের কিছুটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৯৪৪ সালের ১৭ এপ্রিল হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত 'সিন্ধু আরবী ছাত্র সমিতি'-এর অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেনঃ "আমার ইসলাম ঘোষণার পূর্বে আমি তওহীদ ও শির্‌ক্ সম্পর্কে নিজ ঘরে পড়াশোনা করছিলাম; তাতে আমার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে, ইসলামই সত্যিকার তওহীদ শিক্ষা দেয়; তাই আমি অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য দেই; অবশ্য খৃস্টধর্ম ও ইহুদীধর্মের ন্যায় হিন্দু ধর্মও এক সময় সত্য ধর্ম ছিল। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, এতে বর্তমানে শির্‌ক্ অনুপ্রবেশ করেছে।"[১] কুরআন বলে: "ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র (সত্য) ধর্ম।" ঐশ ধর্মরূপে কুরআনে খৃস্টধর্ম ও ইহুদীধর্মের স্বীকৃতি রয়েছে এবং ঐ সব ধর্মের কিতাব ও নবীদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্যেও মুসলমানের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু হিন্দুধর্মের সত্যতা সম্বন্ধে কুরআন বা মুসলমানদের অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে ঐরূপ কোন ভাষ্য নেই। অথচ সিন্ধী বলছেন, হিন্দুধর্মও এক সময় সত্যধর্ম ছিল। এটাকে তাঁর পূর্বপুরুষদের ধর্মেরই জের বলা যায়।

মওলানা সিন্ধী হিন্দু-বেদান্তবাদ ও মায়াবাদী মুসলিম সূফীদের 'ওয়াহ্‌দাতুল্-ওজূদ (একত্ববাদ)-এর মধ্যে একটা ঐক্যসূত্র খুঁজে বের করার প্রয়াস পান। তিনি মনে করতেন, ইবনুল্ আরাবী (১১৬৫-১২৪০ খৃঃ)-পন্থী

মায়াবাদী মুসলিম সূফীদের 'ওয়াহ্‌দাতুল্‌-ওজূদ' হলো-হিন্দু বেদান্ত-বাদেরই সার ও শোধিত সংস্করণ; শাহ্‌ ওলীউল্লাহ্‌ই এই দর্শনের পূর্ণতা ও সংস্কার সাধন করেছেন; এই পথ ধরেই হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা নিজ নিজ ধর্ম বজায় রেখে একটা ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হতে পারে। ১৯৪০ সালের ১১ জুলাই সিন্ধু প্রদেশের থাট্টায় অনুষ্ঠিত জেলা কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন উদ্বোধনকালে সিন্ধী ইউরোপের প্রযুক্তিবাদকে স্বাগত জানিয়ে বলেনঃ "উপমহাদেশে ঐ প্রযুক্তি প্রয়োগ না করা হলে এখানকার জনগণ বৈষয়িক উন্নতি থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং তাদেরকে পরের অস্পৃশ্য দাস হয়ে থাকতে হবে।" এর সাথে সাথে তিনি এই সাবধান-বাণীও উচ্চারণ করেন যে, ঐ প্রযুক্তিবাদের সাথে এ দেশে ইউরোপের ধর্মহীনতা প্রবেশের ততটা আশংকা না থাকলেও তৎসম্পর্কে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। কারণ ঐ ধর্মহীনতা অন্য পথ দিয়েও আসতে পারে। বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির সাথে ধর্মের কোন সংযোগ লক্ষ্য করা যায় না। এর ফলেই মানুষ খোদার অস্তিত্ব অস্বীকার করে বসে। এমতাবস্থায় একমাত্র 'ওয়াহদাতুল্‌-ওজূদ'-এর দর্শনই বিজ্ঞানীকে খোদাবিশ্বাসী করে তুলতে পারে। ঐ উদ্বোধনী-ভাষণে সিন্ধী আরো বলেন, এই দর্শন হিন্দু-দর্শনেরও মৌল। শাহ্‌ ওলীউল্লাহ্‌ এই তত্ত্ব মেনে নিয়েছেন এবং জ্ঞান ও দর্শনের এমন একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা সকল ধর্মের তৃষ্ণা মেটাতে পারে। সিন্ধীর ভাষায় বলতে গেলেঃ "যে মানুষটি (সিন্ধী) একটা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করছে, তার জন্য এ বিপদটি অন্য দিক থেকে আসছে; বর্তমান বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই; মোটকথা, খোদার অস্তিত্ব অস্বীকার করারই উপক্রম হয়েছে; ধর্ম ছাড়তে পারি না বলেই আমি এর প্রতিকারের জন্য সদা চিন্তা-ভাবনা করছি। আমার মতে, এ ক্ষেত্রে 'ওয়াহ্‌-দাতুল্‌-ওজূদ' ছাড়া গত্যন্তর নেই। এর মাধ্যমেই একজন বিজ্ঞানীকে খোদার অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস করানো সম্ভব। এটা হিন্দু-দর্শনেরও সার-কথা। তাই ইমাম ওলীউল্লাহ্‌ এই দর্শনের উপর তাঁর দর্শন-স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এতে সকল ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারবে। আমার দৃঢ় অভিমত হলো—বৈষয়িক উন্নতির জন্য উপমহাদেশকে ইউরোপের গণতন্ত্র ও প্রযুক্তি বিদ্যা সানন্দে বরণ করতে হবে।"[২]

সিন্ধীর উপরোক্ত অধ্যাত্মবাদের পেছনে রাজনৈতিক মানস কাজ করেছে বলে মনে হয়। তাঁর এখানে অধ্যাত্মবাদ ও রাজনীতি একাকার হয়ে গেছে। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের সমর্থক ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়াসী ছিলেন। ঐ ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আকবরের স্বাধীন মুসলিম ভারত-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা* এবং আওরংযেবের একক আইনভুক্ত ঐক্যবদ্ধ ভারত সৃষ্টির[৩] প্রশংসা করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তিনি সূফী সাধকদেরকে মানবতার সেবক বলে আখ্যায়িত করেন এবং শাহ্ ওলীউল্লাহকে সেই শৃঙ্খলের সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব বলে অভিহিত করেন। তিনি আশা পোষণ করেন, হিন্দু-মুসলিম ধর্মের এ সব মানবসেবক যদি আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে পুঁজি করে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন, তবে ভারত আরেকবার মিলনস্থলে পরিণত হবে এবং তা দুনিয়াকে পথনির্দেশ দিতে সক্ষম হবে। সিন্ধীর ভাষায়ঃ "সূফীবাদের এই সব দিশারীদের মৌল চিন্তা হলো 'ওয়াহ্দাতুল্-ওজূদ'[৪] এবং এটা বেদান্ত দর্শনেরও মূলাধার। শাহ্ ওলীউল্লাহ্ এর সংস্কার ও পূর্ণতা সাধন করে মানবতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সেটাকে কুরআন-হাদীসের সারবস্তু বলে তুলে ধরেছেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগাহ্' এবং তাঁর দর্শন বিষয়ক রচনা-'আল্-বুদূরুল্--বাযিগাহ্' ও 'আত্-তাফ্হীমাতুল্-ইলাহিয়াহ্' ইত্যাদিতে এ বিষয়টির পরিষ্কার ভাষ্য রয়েছে। আমার মনে হয়, হিন্দু-মুসলমান--উভয় ধর্মের মানবসেবকরা যদি এগিয়ে এসে ঐ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হন, তবে ভারত আবার নদীসংগমে পরিণত হবে এবং তাঁরা দেশকে পথনির্দেশ দিতে সক্ষম হবেন।"[৫]

১৯৩৯ সালের ৩রা জুন কলকাতায় অনুষ্ঠিত বংগ প্রাদেশিক জমীঅতুল উলামার এক অধিবেশনে সিন্ধী 'ওয়াহ্দাতুল্-ওজূদ' সম্পর্কে বলেনঃ "ইসলামী দর্শন হলো-মূলত ঐ হিন্দুদর্শন, যেটাকে ভারতীয় মুসলিম সূফী

---

* সিন্ধী বলেনঃ "আকবর হলেন প্রথম মুসলমান বাদশা, যিনি এ দেশে আযাদ ইসলামী ভারত-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সাম্রাজ্য ইরান বা তুরস্কের শাসনাধীন ছিল না। সেটা ছিল মুসলিম নেতৃত্বে গঠিত ভারতের একটি জাতীয় সরকার। সেটা ছিল ইসলামী নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও ভারতীয় তহ্যীব তমদ্দুনকে জীবিত করার একটা বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা।"
(সাঈদ আকবর আবাদী, মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী আওর উনকে নাকিদ, সিন্ধ সাগর একাডেমী, লাহোর, ১৯৪৬, পৃঃ ২৮১)

সাধকগণ পূর্ণতায় উপনীত করেছেন। এই পূর্ণতা সাধনের শিক্ষক ও মুর্শিদ ইমাম ওলীউল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না।"৬

মুসলিম সূফীবাদ বেদান্তবাদ থেকে উৎসারিত বা প্রভাবিত---সিন্ধীর এই মতবাদ দার্শনিকদের দৃষ্টিতে যা-ই হোক না কেন, মুসলিম সূফী সাধকরা এটা মেনে নিতে পারেন না। কারণ তাঁদের মতে, আধ্যাত্মিক সাধনা একটা খাঁটি ইসলামী বিষয়; এর সাথে বেদান্তবাদের কোন যোগসূত্র নেই। শাহ্ ওলীউল্লাহ্ সাধারণত মুসলিম সম্প্রদায়সমূহের পরস্পর বিরোধী ধ্যান-ধারণার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করেছেন। ইব্‌নুল আরাবী 'ওয়াহ্‌দাতুল-ওজূদ' তথা মায়াবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। পক্ষান্তরে মুজাদ্দিদ-এ-আল্‌ফ-এ-সানী 'ওয়াহ্‌দাতুশ্ শুহূদ' (একত্ববাদের সাক্ষ্য) তথা দ্বিত্ববাদের সমর্থক ছিলেন। শাহ্ ওলীউল্লাহ্ এই দুই মতবাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করেন এবং বলেন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সত্তা একক ও অদ্বিতীয়; বিশ্বের সৃষ্টিরাজি তাঁর অংগ বা অংশ নয় বটে। কিন্তু তা ঐ একক সত্তার সাক্ষ্য ও প্রমাণ বহন করে। এই সামঞ্জস্য বিধানের মানে এই নয় যে, শাহ্ ওলীউল্লাহ্ বেদান্তবাদ-উদ্ভূত 'ওয়াহ্‌দাতুল্-ওজূদ'-এর উৎকর্ষ বা সংস্কার করেছেন, যেমন মওলানা সিন্ধী বলতে চেয়েছেন। সিন্ধী 'ওয়াহ্‌দাতুল্ ওজূদ' অর্থাৎ সকল ধর্মের মূল এক, তবে সেগুলোর মধ্যে তফাত রয়েছে কেবল রূপের দিকে থেকে---এই ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁর অভিমত এটা ছিল না, যে কোন একটি ধর্মের অনুসরণ করলেই চলবে। তাঁর ভাষায় বলতে গেলেঃ "ওয়াহ্‌দাতুল্-ওজূদ' ---এই বিশ্বাস পুরোপুরি ঠিক এবং এর উপর ভিত্তি করে সকল ধর্মের মূল এক---এই ধারণাটি যথার্থভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ধর্মসমূহের অভিন্নত্বের এ মানে নয় যে, বিশেষ কোন একটি ধর্মকে মান্য করা বা তার নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজনীয় নয়। আকবরের দীন-এ-ইলাহী'-র ভাবুকরা এ বিষয়ে ভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়েছেন। হয়তো বা তাঁরা ইসলামের এই নীতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, কিন্তু কাজের বেলায় করেছিলেন অন্যরূপ। ধর্মসমূহের অভিন্নত্ব মানার মানে হলো-নৈরাজ্য সৃষ্টি করা। ধর্মীয় মতভেদ দূর করার এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ ধর্মকে সমূলে ধ্বংস করারই শামিল। মানুষের জীবন থেকে ধর্মকে তাড়িয়ে দিলে তাদের সমস্যা হ্রাস পাবে না; বরং তা আরো বেড়েই যাবে।"৭

এখানে প্রশ্ন জাগে—আকবরের 'দীন-এ-এলাহী'র প্রতি সিন্ধীর সমর্থন না থাকলে তিনি কিভাবে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা সমর্থন করলেন এবং কিভাবে বল্লেন যে, তাঁর 'দীন-এ-ইলাহী'র ভিত্তি ছিল 'ওয়াহ্দাতুল্-ওজূদ'-এর উপর। তাঁর ভাষায় বলতে গেলেঃ "আকবরের চিন্তাধারার ভিত্তি ছিল 'ওয়াহদাতুল্-ওজূদ'-এর উপর এবং এর উপরই তিনি তাঁর দীন-এ-ইলাহীর ভিত্তি স্থাপন করেন।"[৮]

মূলত আকবরের দীন-এ-ইলাহীর প্রতি সিন্ধীর সমর্থন ছিল না। তিনি মনে করতেন, সারা ভারতের অমুসলমানদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই আকবর রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ কুশলী নীতি অবলম্বন করেছিলেন। সিন্ধী এটাও মনে করতেন, আকবরের অমাত্যবর্গ যদি ভুল পথে পরিচালিত না হতেন এবং ঐ নীতিকে যথাযথভাবে ও সদুদ্দেশ্যে পরিচালিত করা যেতো, তবে সারা ভারতের হিন্দুগণ হয়তো মুসলমান হয়ে যেতো।[৯] এবার শুনুন সিন্ধীর ভাষায়ঃ "বস্তুত আকবরের শাসন ছিল ভারতীয় ইসলামী শাসন। তাঁর রাজনীতিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ইসলামী জাতীয়তাবাদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল। কারণ গোড়ার দিকে ইসলামী শাসনকে ভারতীয় রূপ দেয়ার জন্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন তাঁর অবশ্যই ছিল।"[১০]

সিন্ধীর এখানে পরস্পর বিরোধী ধ্যান-ধারণার সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। তিনি একদিকে আকবরের প্রশংসা করেছেন, আবার অন্যদিকে তাঁর ধ্যান-ধারণার মূলোৎপাটনকারী আলমগীরেরও গুণকীর্তন করেছেন।[১১] সিন্ধী কোন কোন সময় শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌র নামে এমন ভিত্তিহীন কথা বলার প্রয়াস পেয়েছেন, যাতে শাহ্ সাহেবের প্রতি পাঠকদের অভক্তি সৃষ্টি হতে পারে। যেমন সিন্ধী বলেছেন, আকবর ও আলমগীর-উভয়ের প্রতি শাহ্ ওলীউল্লাহ্ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বস্তুত ব্যাপারটি তা নয়।[১২]

সিন্ধী ছিলেন কংগ্রেসী। কংগ্রেসের দাবি ছিল—ভারতবাসী একজাতি এবং ঐ প্রতিষ্ঠানটি হলো হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই। কংগ্রেসীদের নীতি ছিল--হিন্দু-মুসলমান একযোগে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলন করবে এবং ভারত স্বাধীন হলে তা অখণ্ডই থাকবে।

মনে হয়, 'ওয়াহ্দাতুল্-ওজূদ্---এই সূফীবাদী দর্শনের দোহাই দিয়ে সিন্ধী ভারতের হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য তথা সাম্প্রদায়িক খুনখারাবীর অবসান এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, হিন্দুদেরকে মুসলমানদের নিকটবর্তী করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর ঐ চিন্তাভাবনা ছিল একটা দুরাশা মাত্র। কারণ ভারতে বৃটিশ আমলের গোড়া থেকেই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। মুসলিম রাজনীতির গোড়ার দিকে উপমহাদেশে যখন বেশীর ভাগ মুসলিম নেতা কংগ্রেসী ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিলেন, তখনো এই অনৈক্য বিদূরিত হয় নি; তখনো হিন্দুরা দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয় নি। সুতরাং 'বেদান্তবাদ' ও 'ওয়াহ্দাতুল্-ওজূদ' মূলত এক ও অভিন্ন—এই দোহাই দিয়ে অমুসলমানদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করা যাবে না; রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক অনৈক্যও দূর করা সম্ভব হবে না। বাস্তবে তাই প্রমাণিত হয়েছে। শরীঅতকে বাদ দিয়ে যদি তরীকত তথা সূফীতত্ত্বের উপর আমল করা চলে, তবে হয়তো বেদান্তবাদ ও ওয়াহ্দাতুল্ ওজূদের অভিন্নত্বের দোহাই দিয়ে অমুসলমান ও মুসলমানকে কাছাকাছি আনা যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে--মুসলমানের একটা পরিষ্কার শরীঅত ও ধর্মীয় বিশ্বাসভিত্তিক স্বতন্ত্র কৃষ্টি রয়েছে, যা তাদেরকে চিরকাল অমুসলমান থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র জাতিরূপে চিহ্নিত করে রাখবে। মুসলিম জাতীয়তাবাদকে উপমহাদেশীয় ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের অংগে পরিণত করার যে সব চেষ্টা করা হয়েছিল, তা অতীতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ঐরূপ কিছু করা হলে তা-ও ব্যর্থ হতে বাধ্য। জোড়াতালি দেয়ার ঐরূপ মনোভাব ইসলামের জন্য ক্ষতিকর। আকবর আর দারা শেকোহ্-এর ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের ফল কত যে অশুভ হয়েছিল, তা মুসলিম সমাজের কাছে অবিদিত নয়।

সিন্ধী ওহাবী তথা আহলে হাদীসদের মতবাদ পছন্দ করতেন না। তিনি নিজেকে কাদেরী তরীকার একজন ফকীর বলে আখ্যায়িত করতেন এবং আবদুল কাদের জীলানীর (১০৭৭-৮-১১৬৬ খৃঃ) মানস-মুরীদরূপে সিন্ধু থেকে ওহাবী মতবাদ উৎখাতের চিন্তা করেছিলেন। ওহাবীদের বিশ্বাস হলো—ইসলামে পীর-মুরীদীর কোন স্থান নেই; আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে আত্মসমর্পণ করা শির্ক্; তাই কবর ও মাযারের সম্মান করাও তাঁদের মতে শির্ক্। এই মতবাদে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান পালন, বিলাসী

জীবন যাপন ও অন্যান্য অনাবশ্যক কর্ম বর্জনের তাকীদ রয়েছে। দোয়া করতে গিয়ে কোন পয়গাম্বর বা বুযুর্গের নাম ওসিলা (মধ্য সূত্র)-রূপে গ্রহণ করাও তাঁদের মতে এক ধরনের শির্ক। কারণ এগুলো তওহীদের পরিপন্থী। কিন্তু গর-ওহাবী সুন্নীদের মতে পীর-মুরীদী নিষেধ নয়; দোয়ায় ওসিলা-রূপে কোন পয়গাম্বর বা বুযুর্গের নাম উচ্চারণ করাও শরীঅত বা তওহীদ বিরোধী নয়। মওলানা সিন্ধীর সময় সিন্ধু প্রদেশে তওহীদের প্রশ্নে ওহাবী ও গর-ওহাবীদের মধ্যে প্রকট দ্বন্দ্ব ছিল। সিন্ধী ১৯৪৪ সালের ১৭ এপ্রিল হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত 'সিন্ধু জমীঅতুল্-তালাবা'-র এক অধিবেশনে ওহাবী-গর-ওহাবীদের মধ্যে বিদ্যমান ঝগড়া-ঝাটি সম্পর্কে বলেন ঃ "মুসলমানদের এ দ্বন্দ্ব আমার কাছে ভাল লাগে না। শেষ পর্যন্ত আমি এর সমাধানের পথ এটাই খুঁজে পেলাম যে, আমি কাদেরী তরীকার একজন ফকীর; আমি হযরত শায়খ আবদুল কাদের জীলানীর 'ফুতূহুল গাইব' গ্রন্থটি মান্য করি। এতে তওহীদের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে; কিন্তু এতে ওহাবীবাদের লেশ-মাত্রও নেই। আমি যদি এ গ্রন্থকে আমার মৌলিক চিন্তার উৎস বলে গ্রহণ করে থাকি, তবে তার মানে হলো-সিন্ধু থেকে তওহীদের প্রশ্ন উদ্ভূত ওহাবী মতবাদের বাড়াবাড়ি একদিন দূর হবেই।"[১৩]

সিন্ধী ওহাবী মতবাদের প্রতি কিছুটা ক্ষিপ্ত ছিলেন বলেও মনে হয়। তিনি ওহাবী মতবাদের প্রবক্তা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাহ্হাব সম্পর্কে বলেন ঃ "শরীঅতের ক্ষেত্রে তিনি গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন লোক ছিলেন না। তিনি এমন কোন উস্তাদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, যিনি তাঁকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারতেন। ফলে তিনি ধর্মকর্ম বিষয়ে যথার্থ ও যথোপ-যুক্ত জ্ঞান লাভের মত বিদ্যা অর্জন করতে পারেন নি।"[১৪] উপমহাদেশীয় আহলে হাদীসগণ শাহ্ ইসমাঈল শহীদকে আহলে হাদীস তথা ওহাবী মতবাদের প্রবক্তা বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু মওলানা সিন্ধী তাঁকে ওহাবী নয় বলেই প্রমাণ করার প্রয়াস পান। তিনি বলেন ঃ "ইসমাঈল শহীদের শত্রুরা তাঁর প্রতি অন্যায় আচরণ করেছেন; তারা তাঁর সহচর ও অনুসারীদের প্রতি অযথা শত্রুতা করেছেন। তাঁর তরীকাকে তাঁরা শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের তরীকা বলে অভিহিত করছেন এবং তাঁকে ওহাবী বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই পবিত্র লোকটি নজ্দও চিনতেন না এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবের সাথে

তাঁর পরিচয়ও ছিল না। এই পরিবারটি ছিল হানাফী ফিক্হের অনুসারী এবং এতে অনেক বুযুর্গ লোক জন্মগ্রহণ করেছেন।"[১৫]

সিন্ধী তাঁর 'যাতী ডায়েরী' গ্রন্থে লিখেছেনঃ "মানুষের জন্য ইসলামের চাইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন ধর্ম, আর কোন দর্শন, আর কোন সভ্যতা ও আর কোন আইন পৃথিবীতে নেই।"[১৬] তাঁর মতে ইসলাম হলো-প্রগতির ধর্ম ; এর মৌলিক বিষয়গুলো অপরিবর্তনীয়; কিন্তু এর আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ যুগের প্রয়োজনে পরিবর্তন-পরিবর্ধনযোগ্য। তিনি বলেন, "ইসলাম ধর্ম কোন দেশ, জাতি বা যুগের সাথে সীমাবদ্ধ নয়; তা হলো মানবত্ত্বের ধর্ম; কুরআন-এ-করীম হলো এই মানব ধর্মেরই ভাষ্যকার।"[১৭]

স্যার সৈয়দের ন্যায় সিন্ধীও মনে করতেন, শুধু কুরআনই ইসলামের উৎস ; ইসলামের মৌল নীতি উৎসারিত হয় কুরআন থেকে। তাঁর ভাষায়ঃ "ইসলামের ভিত্তি হলো শুধু কুরআন। এই গ্রন্থেই ইসলামের মৌল নীতি নিহিত। ইসলামের সমষ্টিগত জীবনের মৌলিক নীতিমালার নির্দেশ কুরআনেই আছে এবং সেগুলো অপরিবর্তনীয়। কিন্তু যখনি কোন নীতি তথা শরীঅতী কানুনের বাস্তবায়ন শুরু হয়, তখন সম্বোধিত (আইন-প্রযুক্ত) ব্যক্তিদের অবস্থানুযায়ী কতেক আনুষংগিক আইনও প্রণীত হয়। মৌলিক আইন তো অপরিবর্তনীয়ই থাকে, কিন্তু আনুষংগিক আইনগুলো যুগের প্রয়োজনে পরিবর্তিত হতে পারে। এসব আনুষংগিক আইনকেই আমরা 'সুন্নাত' বলে থাকি।"[১৮]

সিন্ধী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধান্দায় পড়ে ভারতীয় সভ্যতা উৎ-ঘাটনের প্রয়াস পান। ইসলামী সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। স্বতন্ত্রভাবে ইসলামী সভ্যতা বর্ণনা বা প্রচারের প্রবণতা তাঁর মধ্যে তেমন একটা লক্ষ্য করা যায় না। কারণ তিনি ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম যুক্ত জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর পরিকল্পিত বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি যেন মুসলিম দুনিয়া ও মুসলিম বিশ্ব-সভ্যতাকে ভুলেই গিয়েছিলেন। কেবল ১৯৪৪ সালে লারকানা জেলার শাহাদাত কোর্টে অনুষ্ঠিতব্য 'মুহাম্মদ কাসেম ওলীউল্লাহ্ থিয়লজিক্যাল কলেজ' উদ্বোধনের জন্য লিখিত ভাষণে তিনি হিন্দু সভ্যতার কথা না বলে মোগল যুগীয় কিছুটা গৌরবময় মুসলিম ইতিহাস তুলে ধরেছিলেন। সাধারণত তিনি ভারতীয় মুসলিম সভ্যতার পাশাপাশি ভারতীয় হিন্দু সভ্যতা, আবার ভারতীয় হিন্দু

সভ্যতার পাশাপাশি ভারতীয় মুসলিম সভ্যতা বর্ণনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। কংগ্রেসী তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রচারের মোহে তিনি যেন কুরআন-হাদীস আর রামায়ণ-গীতাকে সমতালে চালাতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, ভারতীয় সভ্যতা হলো-আদি হিন্দু সভ্যতা ও মুসলিম শাসন যুগীয় সভ্যতারই অভিব্যক্তি। তিনি ভারতীয় সভ্যতাকে ধর্মভিত্তিক এবং ইউরোপীয় সভ্যতাকে ধর্মবিবর্জিত বলে আখ্যায়িত করেন।[১৯] ১৯৪০ সালের ১২ জুলাই থাট্টায় (সিন্ধু) জেলা কংগ্রেস কমিটিতে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে তিনি সংক্ষেপে ভারতের আদ্যোপান্ত হিন্দু-মুসলিম সভ্যতা তুলে ধরেন এবং ভারত বিশ্বের আসরে এক উজ্জ্বল ও গৌরবময় ইতিহাসের অধিকারী বলে গর্ব অনুভব করেন। ভারতীয় সভ্যতার এই অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও তিনি বৈষয়িক উন্নতির জন্য ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লব আনয়ন ও ইউরোপীয় জীবনপদ্ধতি বরণের জন্য দেশবাসীকে উৎসাহিত করেন। এটা ছিল তাঁর ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে গঠিত 'যমুনা-নর্মদা-সিন্ধ্-সাগর পার্টি'রই অন্যতম মূলনীতি।[২০]

সিন্ধী ভারতীয় ভাষাসমূহকে ভারতের ঐতিহ্যবাহী অক্ষরে না লিখে রোমান অক্ষরে লেখার পরামর্শ দেন। তিনি ১৯৩৯ সালের ৩রা জুন কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'বংগ প্রাদেশিক জমীঅত-এ-উলামা-এ-হিন্দ্ এর এক সভায় সভাপতির ভাষণে সিন্ধুবাসীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, তাঁরা সিন্ধুতে প্রস্তুত পোশাক-পরিচ্ছদ পরবেন, তবে তা হবে কোট-পেন্ট বা কলার বিশিষ্ট কামিসের আকারে; কিন্তু সব অবস্থাতেই তাঁরা বিলেতী হেট ব্যহার করবেন। তিনি আরো বলেন, আফগানিস্তানের আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের আদেশে তাঁর সিপাহীরা বুট পরিধান করে নামায পড়তো এবং তিনি তা স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি সিন্ধুর জনসাধারণের কাছে এই প্রত্যাশা করেন যে, তাঁরাও অনুরূপ কাজ করবেন।[২১] এটা বোধগম্য নয় যে, ভারতে ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লব আনার সাথে ইউরোপীয় জীবনপদ্ধতি বা ইউরোপীয় স্টাইলের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের কী সম্পর্ক ছিল? গোঁড়া কংগ্রেসী ও জাতীয়তাবাদীরূপে তাঁর মধ্যে একদিকে ছিল প্রত্যেকটি বস্তুর ভারতীয়করণের প্রয়াস, অন্যদিকে সমাজ-বিপ্লবীরূপে ছিল শিল্প ভিত্তিক ইউরোপীয় আধুনিক সভ্যতা ও কৃষ্টি বরণের প্রবণতা। তাঁর ভাষ্যসমূহ পাঠ করলে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, তিনি ছিলেন ইসলামিক সোশ্যালিস্ট। তিনি রাশিয়ায়

যে সমাজবিপ্লব দেখেছিলেন এবং কামাল পাশার নব্য তুরস্কে যে সংস্কার ও জাতীয়তাবাদ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা ভারতেও প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। তবে তিনি ধর্মহীনতাকে প্রশ্রয় দিতে চান নি। তিনি কামাল পাশার সংস্কারকে ভাল মনে করেছিলেন; কিন্তু তাঁর ধর্মশূন্যতাকে নয়। তাঁর ভাষায় বলতে গেলে ঃ "তুরস্কে কামালবাদের সাথে ধর্মশূন্যতাও প্রবেশ করেছে। আমরা ধর্মহীনতার প্রশ্নে নীরব থাকতে পারি না। এই ধর্মহীনতাকে রুখে দাঁড়াবার জন্য শাহ্ ওলীউল্লাহ্‌র দর্শনের শিক্ষাকে আমাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি।"[২২]

সিন্ধী ইউরোপীয় সমাজ-বিপ্লব বাস্তবায়িত করার প্রশ্নেও ধর্মকে উপেক্ষা করেন নি, বরং সমাজবাদের সংগে ধর্মের সংযোগ স্থাপনের প্রশ্ন তুলেছেন। ১৯৪১ সালের জুন মাসে মাদ্রাজ প্রদেশের কুম্বাকুনামে অনুষ্ঠিত ভারত বিভাগ-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আয়োজিত এক সভায় তিনি বলেন ঃ "যমুনা-নর্মদা সিন্ধু সাগর পার্টিকে এমন এক উচ্চ নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত করুন, যাতে আপনাদের ধর্মনীতি ও অর্থনীতির সমাবেশ ঘটে। এই পার্টির ধ্যানধারণা যুক্তি ও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হোক। সদস্য সংখ্যার আধিক্য বা অনাধিক্যের প্রতি লক্ষ্য করবেন না। ভারতীয় মুসলমানের শক্তি খুবই বেশী, যে সম্পর্কে তাঁরা নিজেরাও অনুমান করতে পারছেন না। বুদ্ধিমান ছোট একটি দলও দেশকে পরিচালিত করতে পারে। ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় এই যোগ্যতা মুসলমানদের মধ্যেই বেশী রয়েছে।"[২৩]

সিন্ধীর মতে, কুরআন সম্মত শাসন বলতে কেবল ঐ শাসনকেই বোঝায় না, যা খিলাফত-এ-রাশিদার যুগে বিদ্যমান ছিল। কারণ খিলাফত-এ-রাশিদা-যুগের হুবহু শাসনপদ্ধতি সব যুগে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। ঐ শাসনের মৌলিক কাঠামো বজায় রেখে যুগের নিরিখে তাতে কিছুটা পরিবর্তন-পরিবর্ধন অবশ্যই করতে হবে। তাঁর ভাষায় ঃ "চলে যাওয়া যুগ ফিরে আসে না; বয়ে যাওয়া পানি প্রত্যাবর্তন করে না। কুরআনের আলোকে খিলাফত-এ-রাশিদা তথা ইসলামের প্রথম যুগে সাহাবিগণ যে শাসন কায়েম করেছিলেন, হুবহু সেই শাসন এখন আর বাস্তবায়িত করা যাবে না। যাঁরা কুরআনের শাসনকে অপরিবর্তনীয় বলে মনে করেন, তাঁরা এর সঠিক তাৎপর্য জানেন না। এতে সন্দেহ নেই যে, খিলাফত-এ-রাশিদার শাসন হলো কুরআনী শাসনের একটা আদর্শ। কিন্তু হুবহু ঐ আদর্শ যুগে যুগে হস্তান্তরিত হতে পারে না।"[২৪]

সিন্ধী মুসলমানের বাহ্য বেশভূষা বা আঞ্চলিক রীতিনীতির উপর গুরুত্ব আরোপ না করে তাদের মানসিক ও নৈতিক দৃষ্টিভংগি এবং ধর্মের মূল উদ্দেশ্যের উপর বেশী জোর দিতেন। বাহ্য দিক থেকে ভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ বা ভিন্ন রীতিনীতি অবলম্বন করতে দেখে কাউকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা তাঁর কাছে ছিল গর্হিত। তাঁর ভাষায়ঃ "দুর্ভাগ্যবশত লোকেরা নিজ খান্দান বা শুধু নিজ দেশের বিশেষ আচার-আচরণকেই সত্য ধর্ম বলে ধরে নিয়েছে, এবং যারা বাহ্য দিক থেকে ভিন্ন রীতিনীতি অবলম্বন করে, তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করে থাকে। তারা এটা লক্ষ্যই করছে না যে, ধর্মের যা আসল উদ্দেশ্য, তা তারা পালন করছে কি না?"[২৫]

সিন্ধী জীবনের প্রথম দিকে সক্রিয় জিহাদের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পরিকল্পিত বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি বলতে লাগলেন—জিহাদ বলতে বোঝায় সমাজ বিপ্লব। তাঁর মতে জিহাদের দু'টি স্তর আছেঃ সাধারণত জিহাদের শর্ত হলো-দেশে মুসলমান শাসক থাকবে এবং কাফেরদের সাথে লড়াই করার মত সামরিক ক্ষমতাও তাদের থাকবে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, কোন মুসলমান শাসকও থাকবে না এবং তারা সামারিক ক্ষমতারও অধিকারী হবে না। ঐ অবস্থায় মুসলমানের উপর ফরয হলো-তারা নিজেরাই দল গঠন করবে এবং জিহাদে অবতীর্ণ হবে। কাবুলের ব্যর্থতার পর সিন্ধী শেষোক্ত জিহাদের সমর্থক হয়ে উঠেন।[২৬] তিনি বলতেন, শেষোক্ত জিহাদকেই ইউরোপে সমাজ বিপ্লব বলা হয়। হেজায থেকে ফিরে এসে তিনি দেশবাসীকে এই জিহাদেরই তালীম দেন।

সিন্ধী মুসলমানদের সুখী জীবন কামনা করতেন। তিনি চেয়েছিলেন সত্যিকারভাবে তাদের ধর্ম বজায় থাকুক, আবার অর্থ-সামর্থ্যেও তারা উন্নতি লাভ করুক। একজন ইসলামিক সোশ্যালিস্টরূপে তিনি ইহকাল ও পরকালের মধ্যে এবং আধ্যাত্মিকতা ও বৈষয়িকতার মধ্যে একটা সেতু-বন্ধ সৃষ্টির পয়গাম দিয়ে গেলেন। তাঁর কর্মকাণ্ডের সফলতা যতখানিই হোক না কেন, তাঁর আন্তরিকতায় কোন অভাব ছিল না। এমন চিন্তাবিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজ দরদী ও মরদে মুমিন আজ আমাদের সমাজে মেলা ভার। সর্বশেষে তাঁর কামনা-বাসনা সংবলিত একটি উদ্ধৃতি পেশ করে মূল প্রবন্ধটির ইতি টানছি।

তিনি বলেন ঃ

আমি চাই, ইউরোপের ঐ বৈষয়িক উন্নতিকে মেনে নেয়া হোক—চলুন, জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতিকে আমরা আমাদের জীবনের ভিত্তি বলে পরিগণিত করি; তবে এটা যেন মনে না করা হয় যে, বিজ্ঞানই জীবনের সব কিছু। এই জড় পৃথিবীতে বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করেছে, তা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু জীবন শুধু জড় পৃথিবীতেই শেষ নয়, বরং এই জড় জগত অন্য একটি অস্তিত্বেরই ছায়ামাত্র; এই জড় জগতের কেন্দ্র হলো অন্য একটি সত্তা। সেই সত্তাই প্রকৃত জীবন এবং জীবনের সহায় ও উৎসমূল। ----- জীবনের বৈষয়িক দিকটি অসম্পূর্ণ। কারণ তা জীবনের একটি মাত্র দিকই নির্দেশ করে। জীবনের সঠিক ও পূর্ণ ধ্যানধারণা নিহিত রয়েছে-'রব্বানা আতিনা ফিদ্-দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া-ফিল্-আখিরাতি হাসানাহ' (হে খোদা দাও মংগল আমাদেরকে এ জীবনে এবং পরজীবনেও)—এই মর্মবাণীর মধ্যে। এই ধারণাটাই জীবনের সব দিক ধারণ করে।[২১]

তথ্যনির্দেশ

১. খুতুবাত ১৪৬-৪৭
২. ঐ ১১১-১১২
৩. ঐ ১০৫
৪. 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ'-এর ব্যাখ্যায় সিন্ধী বলেন ঃ "ওয়াহ্দাতুল ওজুদ মানে-বিভিন্ন ধর্মের সত্যতা বিভিন্ন রূপে প্রকাশ লাভ করে; আসল ধর্ম এক, কেবল রূপের তফাত। কিন্তু এটা কি করে বোঝা যাবে যে, আসল ধর্ম কি? ঐ সত্য কোন্টি, যা বিভিন্ন রূপে প্রকাশ লাভ করে? ঐ নীতিগুলো কি, যা সকল ধর্মের মধ্যে অভিন্ন? ইব্নুল আরাবী ও তাঁর অনুসারীদের অভিমতে-ইসলামই ঐ সত্যের মাপকাঠি। এই মাপকাঠি দিয়েই সকল ধর্মের সত্যতা বিচার করা যেতে পারে। এই অর্থে ওয়াহ্দাতুল্ ওজুদকে মানলে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের গায়ে আঁচড় লাগবে না, বরং এতে ইসলামের যথার্থতাই প্রতিপন্ন হবে। এ জন্যই ইবনুল আরাবী এই চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেছেন।"

(সাঈদ আহমদ আকবর আবাদী, মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী আওর উন্‌কে নাকিদ, সিন্‌ধ্ সাগর একাডেমী, লাহোর, ১৯৪৬, পৃঃ ২৪৩)

৫. খুতুবাত ১৭৯
৬. ঐ ৯৪-৯৫
৭. সাঈদ আহমদ আকবর আবাদী, মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী আওর উন্-কে-নাকিদ, সিন্‌ধ্ সাগর একাডেমী, লাহোর, ১৯৪৬, পৃঃ ২৪৪-২৪৫
৮. ঐ ২৮১
৯. ঐ ২৪৭
১০. ঐ ২৮২
১১. ঐ ২৮৩
১২. ঐ ২৮৪
১৩. খুতুবাত ১৪৭
১৪. উবায়দুল্লাহ্, সিন্ধী, শাহ্ ওলীউল্লাহ্ আওর উন্‌কী সিয়াসী তাহ্‌রীক, সিন্‌ধ্ সাগর একাডেমী, লাহোর, ১৯৫২, পৃঃ ১৯৭
১৫. ঐ পৃঃ ১৯৮
১৬. নক্‌শ-এ-হায়াত (২) ১৫৭
১৭. সাঈদ ২৭১
১৮. উবায়দুল্লাহ্, সিন্ধী, শাহ্ ওলীউল্লাহ্ আওর উন্‌কা ফালসাফা, সিন্‌ধ্ সাগর একাডেমী, লাহোর ১৯৪৪, পৃঃ ৮৬-৮৭
১৯. খুতুবাত ৮৫
২০. ঐ ১৮২
২১. ঐ ৮৮-৮৯
২২. উবায়দুল্লাহ্, সিন্ধী, শাহ্ ওলীউল্লাহ্ আওর উন্‌কী সিয়াসী তাহরীক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৮
২৩. খুতুবাত ১০৮-১০৯
২৪. সাঈদ ২৬৩
২৫. ঐ ২৬৪
২৬. খুতুবাত ১৫০-১৫১
২৭. ইকরাম, এস. এম. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬৫-৬৬

পরিশিষ্ট এক

ভারতের স্বাধীনতা ও স্বাধীন ভারত-সরকারের জন্য ১৯২৪ সালে ইস্তাম্বুল থেকে উর্দুতে প্রকাশিত উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর কর্মসূচী

১. ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন ও আযাদ ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) সরকার গঠন।

২. ভারতে মুসলমান, অন্যান্য সংখ্যালঘু ও ইসলামের স্বার্থ সংরক্ষিত করা।

৩. ভারতে, শ্রমিক শ্রেণী তথা কৃষক, মজুর ও বুদ্ধিজীবীদের প্রাধান্য থাকবে—এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা; জমিদারি ও পুঁজি-বাদকে দেশ থেকে উৎখাত করা, তা হলে যেন লোকেরা কম্যুনি-জমের লোভ দেখে প্রতারিত না হয়।

৪. সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জন্য এশিয়াটিক ফেডারেশন গঠন করা।

সর্বরাজ্য পার্টি

সর্বরাজ্য পার্টির সদস্যপদ ঃ

সর্বরাজ্য পার্টির সদস্যরা তাঁদের জীবন-পদ্ধতির মান দেশের কৃষকদের চাইতে উন্নত রাখার চেষ্টা করবেন না। অর্থাৎ এতটুকু আয় দিয়ে তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করবেন, যতটুকু দিয়ে মধ্যম শ্রেণীর কৃষকরা করে থাকে; এর বেশী তাঁদের যে অর্থ বা সম্পত্তি হবে, তা পার্টিকে দেবেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি

সর্বরাজ্য পার্টি ভারতকে একটি দেশ বলে মনে করবেন না; ভারতে একক জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির কোন চেষ্টাকে তাঁরা আযাদীর বুনিয়াদ বলে

সমর্থন করবেন না। বরং তাঁরা দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা করবেন, যার জন্য নিম্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে ঃ

ভৌগোলিক দিক থেকে ভারত উত্তর-পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ—এই তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত। তাই ঐ অঞ্চলগুলোকে অভিন্ন ভাষা, অভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও অভিন্ন তমদ্দুনের ভিত্তিতে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করা হবে। অতঃপর ঐ প্রদেশগুলোর প্রত্যেকটিকে একটি গণতান্ত্রিক স্টেটে পরিণত করা হবে। প্রত্যেকটি স্টেটের গণতান্ত্রিক সরকার পরাষ্ট্রনীতি, দেশরক্ষা এবং বহির্বাণিজ্য ছাড়া অন্য সব বিষয়ে স্বাধীন থাকবে। যেমন ঃ উত্তর-পশ্চিম ভারত-এই অঞ্চলটি পূর্ব পাঞ্জাব, পশ্চিম পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, কাশমীর, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও গুজরাট—এরূপ কয়েকটি গণতান্ত্রিক স্টেটে বিভক্ত হবে। অনুরূপভাবে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতকেও কয়েকটি গণতান্ত্রিক স্টেটে বিভক্ত করা হবে।

এই গণতান্ত্রিক দেশগুলো কেন্দ্রীয় ফেডারেল গভর্নমেন্টে যোগদানের পূর্বে ইচ্ছা করলে কয়েকটি দেশ মিলে তাদের অভিন্ন তমদ্দুন ও আচার-অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র একটা ফেডারেশন গঠন করতে পারে—যেমন ঃ পশ্চিম পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান—এই ক'টি দেশ আপোসে ভিন্ন একটা ফেডারেশন গঠন করে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান করতে পারে। এমনিভাবে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের গণতান্ত্রিক দেশ-গুলো ইচ্ছা করলে সর্বসম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র একটা ফেডারেশন গঠন করে কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকারে প্রবেশ করতে পারে।

ব্যবস্থাপক সভা

এই গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে প্রত্যেক সজ্ঞান প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষকে ভোটাধিকার দেয়া হবে। সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণী (Social class) যেমন কৃষক, মজুর, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি তাদের নিজ নিজ সংখ্যানু-পাতে ব্যবস্থাপক পরিষদের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এর ফলে এই সব গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টে কৃষক, মজুর ও বুদ্ধিজীবী লোকদের প্রাধান্য বজায় থাকবে এবং এই ব্যবস্থাপক পরিষদ খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে।

র্থ-সামাজিক মুলনীতি

জনস্বার্থের যাবতীয় উৎস জাতীয় মালিকানাধীন থাকবে। ব্যক্তিগত লিকানা (স্থাবর-অস্থাবর) সীমিত করা হবে অর্থাৎ নির্ধারিত পরিমাণের তিরিক্ত সম্পদ ও সম্পত্তি জাতীয় মালিকানাধীন থাকবে। সংগতিসম্পন্নদের পর কর আরোপ করা হবে, যার সর্বোচ্চ সীমা হবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। শের ভূমি জাতীয় মালিকানাধীন থাকবে। জমিদারি প্রথার বিলোপ ধন করা হবে। যেসব গণতান্ত্রিক দেশে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য থাকবে, খানে সর্বরাজ্য পার্টি হযরত উমরের সিদ্ধান্ত মাফিক জমির মালিকানা াগের জন্য এবং ইমাম আবু হানীফার সিদ্ধান্ত মুতাবিক চাষাবাদ ড়ার জন্য জমিদারদেরকে বাধ্য করবে। প্রত্যেকটি কৃষক পরিবারকে তটুকু ভূমি অবশ্যই দিতে হবে, যতটুকু তারা নিজেরা চাষাবাদ করতে ক্ষম।

সূদী লেনদেন বন্ধ করা হবে। শ্রমিক শ্রেণীর পূর্বকার ঋণ মওকুফ রা হবে।

সরকারী মালিকানায় প্রদত্ত কারখানাগুলো মজদুরদের সমবায় সমিতির াধ্যমে পরিচালিত হবে। মজদুরদেরকে মুনাফার অংশ দেয়া হবে।

শ্রমিকদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা-সাহায্য দেয়া হবে। তাদের জন্য রিচ্ছন্ন বাসভবনের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হবে।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কো-অপারেটিভ সোসাইটির হাতে দেয়া হবে। ব্যবসায়ীরা কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে যোগদান করে সোসাইটির সদস্য হতে পারবে।

বহির্বাণিজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে।

প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মকে স্টেট-ধর্মরূপে পরিগণিত করা যাবে। তবে শর্ত হলো-ঐ ধর্ম যেন 'পার্টির' উপরোক্ত আর্থ-সামাজিক নীতির পরিপন্থী না হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র
(Central Govt. of the Federal Republic of India)

প্রত্যেকটি স্টেটের ধর্মগুলোর সাথে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কো সম্পর্ক থাকবে না। কোন ধর্মে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কেন্দ্রীয় সর কারের থাকবে না। তার মানে-কেন্দ্রীয় সরকার হবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার।

পররাষ্ট্রনীতি, দেশরক্ষা ও বর্হিবাণিজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে

গণতান্ত্রিক স্টেটসমূহ তাদের সংখ্যানুপাতে আর্থিক, তামাদ্দুনিক ও সামরিক গুরুত্বের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারে প্রতিনিধি প্রেরণ করবে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

সাম্রাজ্যবাদের অবসান এবং উল্লিখিত নীতিমালা অনুসারে এশিয়ায় আযাদ গভর্নমেন্টসমূহ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এশিয়াটিক ফেডারেশন গঠন কর হবে, যাতে রাশিয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।[১]

১. সরওয়ার, মুহাম্মদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫২-৪৬০

পরিশিষ্ট দুই

(১৯৩৩ সালে মক্কায় লিখিত উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর 'যাতী ডায়েরী'-র অংশ বিশেষ)

উপমহাদেশীয় মুসলমানের উৎপত্তি

ইতিহাস পাঠ করে হিন্দু যুবকরা এই মত পোষণ করেন যে, হিন্দুরা নাকি মৌলিক ভারতীয়, আর মুসলমানরা ইংরেজদের ন্যায় অন্যতম বহিরাগত বিজেতা জাতি। তাই তাঁরা যখন বিদেশী লোকদের কাছে ভারতের পরিচয় দেন, তখন মুসলমানদেরকে বহিরাগত বলেই তুলে ধরেন। এতে সন্দেহ নেই যে, এখানকার মুসলমান অভিজাতদের বড় একটি অংশ আরব-অনারবদের সন্তান। এই অভিজাত শ্রেণীর মুখ থেকে কোন কোন সময় এমন কথাও বেরিয়ে পড়ে, যাতে হিন্দু যুবকরা তাঁদের ধারণার সমর্থন পেয়ে যান। আমার বিশ্বাস, পাঠকদের কাছে আমার এ পরিচয় অজানা নয় যে, আমার জন্ম হয়েছে এক হিন্দু পরিবারে। এক ব্রাহ্মণ থেকে ধার নিয়ে আমি জনৈক হিন্দু নওমুসলিমের লেখা-'তুহ্ফাতুল্-হিন্দ্' পড়েছিলাম। এর ফলে ইসলামের সত্যতার প্রতি আমার বিশ্বাস জন্মে এবং আমি ১৬ বছর বয়সে ইসলামে দীক্ষিত হই। ৩২ বছর বয়সে ধর্মীয় শিক্ষা শেষ করে আমি 'দারুল উলূম' দেওবন্দ থেকে 'ফাযেল' পাসের সার্টিফিকেট লাভ করি। জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ভারতের সাধারণ মুসলমান, বিশেষত নিম্ন শ্রেণীর কৃষক-মজুরেরা এখানকার পূর্ববর্তী হিন্দুদেরই সন্তান। এঁরা ইসলামের দীক্ষা লাভ করেছেন। আর যে সব মুসলমান বিজেতার বেশে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন, এখানকার অধিবাসী হয়ে গিয়েছিলেন এবং এই নতুন ধর্ম (ইসলাম) ও তমদ্দুনকে ভারতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের সন্তানরাই প্রথম শ্রেণীর ভারতীয়।

হিন্দু সম্প্রদায়ের যে সব লোকেরা এখানকার দীক্ষিত মুসলমান ও বিজেতা মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন, তাঁরা বোকামিজনিত অজ্ঞতার শিকারে পরিণত। আমাদের ভাইদের (হিন্দুদের) উচিত, যথা-সত্বর এই ভ্রান্তি থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা। আমি এ মর্মে নিশ্চিত যে, মানবতার জন্য ইসলামের চাইতে উৎকৃষ্ট আর কোন ধর্ম, আর কোন দর্শন, আর কোন তমদ্দুন, আর কোন আইন পৃথিবীতে নেই। ভারতীয়দের (হিন্দুদের) উচিত-ইসলামের এই উৎকৃষ্ট সভ্যতাকে সগৌরবে মেনে নেয়া। দুর্ভাগ্যবশত যদি তা না হলো, তবে আমরা নব দীক্ষিত মুসলমানরা কি এতই অথর্ব হয়ে পড়েছি যে, আমরা আমাদের সংখ্যানুপাতে নিজেদের ধর্মের ইজ্জত (রাজনৈতিক অধিকার) সকল ভাইদের (হিন্দুদের) নিকট থেকে আদায় করে নিতে পারবো না? ইসলাম গ্রহণের পর যে কোন ভারতীয় নিজেকে অধিকতর বাহাদুর ও অধিকতর কৃষ্টিসম্পন্ন বলে মনে করে থাকে।[১]

---

১. নক্‌শ-এ-হায়াত (২), পৃষ্ঠা: ১৫৬-১৫৭

পরিশিষ্ট তিন

(১৯৪০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বরে লিখিত উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর একটি প্রকাশিত উর্দু প্রবন্ধের অনুবাদ)

আমরা কি চাই?

আমরা ভারতের রাজনীতির অংগনে 'যমুনা-নর্মদা সিন্ধ্ সাগর পার্টি' নামে একটি নতুন দল গঠন করতে চাই, যার কাঠামো প্রস্তুতির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করেছি। আজ আমরা ঐ পার্টির উদ্দেশ্যাবলীর উপর কিছুটা আলোকপাত করতে চাই এবং এটা বলতে চাই যে, এ পার্টি কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে, আর এর শক্তির উৎস কি হবে?

১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর ভারতের মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটার কেন্দ্র ছিল দিল্লীতে, অপরটির দেওবন্দে। আলীগড় সৃষ্টি করেছে মুসলিম লীগ, আর এটা হলো তার রাজনীতির আলোকবর্তিকা। দেওবন্দ সৃষ্টি করেছে 'জমীঅত-এ-উলামা-এ-হিন্দ্'। এই দলের কর্মকাণ্ড উপলব্ধি করা যেতে পারে তাঁদের রাজনীতির আলোকে। এখন উভয় আন্দোলনই থেমে গেছে; মুসলমানদের উদ্দেশ্যের তরী কূলে ভিড়তে পারেনি।

আমরা জানি, মুসলিম লীগে চিন্তাবিদদের বিশেষ একটি দল আছে, যাঁরা তাঁদের কর্মসূচীতে সন্তুষ্ট নন; তবু তাঁরা নিজেদের কোন কোন প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে লীগের সাথেই হামাগুড়ি দিয়ে চলছেন। অনুরূপভাবে আমরা এটাও জানি যে, 'জমীঅত-এ-উলামা-এ-হিন্দ্'-এর অনেক আলিম 'জমীঅত'-এর কর্মসূচীতে নিরাস হয়েছেন। আমরা ঐ প্রগতিবাদী অস্থিরমতি শক্তিবর্গের কাছে আমাদের নিজস্ব কর্মসূচী পেশ করতে চাই।

কর্মসূচীর একটা গুরুত্বপুর্ণ অংশ

আমাদের কর্মসূচীর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো—আমরা ভারতের রাজনীতিতে আমাদের ভূমিকা আমাদেরই আয়ত্তে আনতে চাই এবং এখন থেকে এর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে চাই। এ ব্যাপারে বহিরাগত মুসলমানদের কাছে আমরা কিছুই আশা করি না, এমন কি কোন বহির্শক্তি যদি ভারতের উপর আক্রমণ চালায়, তা মুসলিম শক্তিই হোক না কেন, আমরা নিজেদের পূর্ণ শক্তি দিয়ে তার মুকাবিলা করবো। আমরা মনে করি, কোন মুসলমান শক্তির এই অধিকার নেই যে, আমাদের উপস্থিতিতে তারা ইসলামের নামে ভারতের মাটিকে পদদলিত করার চেষ্টা করবে। আমরা কি মুসলমান নই? আমাদের কি নিজ দেশ শাসন করার কোন অধিকার নেই? এতে সন্দেহ নেই যে, আমাদের শাসন ক্ষমতা দৃঢ় করার অধিকার বহির্বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর নিশ্চয়ই রয়েছে। কিন্তু তাঁরা ভারত আক্রমণ করে তা জয় করার চেষ্টা করবেন—তাঁদের সেই পদক্ষেপ আমরা কখনো মেনে নিতে পারি না। আমরা ভারতে ভারতীয় শাসন কায়েম করবো—এটা আমাদের অধিকার। এ বিষয়ের উপর আমরা যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারি এবং এমনিভাবে শ'-দেড় শ' বছরের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা দূর করতে পারি।

ভারতীয় মুসলমান ও ইসলামী দেশ

এখানে এ বিষয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এজন্য ইংগিত দেওয়াই যথেষ্ট মনে করি।

মোগল শাসনের শেষ দিকে শাহ আবদুল আযীযের দল যখন দিল্লীর দুর্বলতা দূর করতে চাইলেন, তখন তাঁদেরকে কোন মুসলিম শক্তি সাহায্য করে নি। আমাদের পূর্বপুরুষরা নিজ দেশে শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন। তাই আমরা ঐ উচ্চ ধারণা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না। আমাদের ভারতীয় দিশারিগণ বহুকাল ধরে শুনিয়েছেন ঃ কবিতার একটি চরণ ঃ

"নানা ব্যাখ্যার দরুন বিগড়ে গেছে আমাদের স্বপ্ন।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁরা এই বিগড়ে যাওয়ার কারণ ভালরূপে খতিয়ে দেখেন নি। আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এর একমাত্র কারণ হলো

ভারতের মুসলমানদের দৃষ্টি সব সময় বিদেশী সাহায্যের প্রতি নিবদ্ধ ছিল বা নিবদ্ধ রাখা হয়েছিল। নিজ সিদ্ধান্তানুসারে নিজ দেশে শাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি। সেই চিন্তার উদ্রেকের সুযোগও দেওয়া হয়নি। যাঁরা এই ভ্রান্ত পথে পদচারণা করেছেন, তাঁদেরকে প্রথম যুগের জন্য ক্ষমার চোখে দেখা যেতে পারে। কিন্তু এই জাগরণের যুগে যখন দিবালোকের ন্যায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন বহিরাগত পথনির্দেশের উপর ভরসা করা আমাদের জন্য বিষবৎ ; তাই যাঁরা আমাদেরকে এখনো সেই ভ্রান্ত ধারণায় ফেলে রাখতে চান, তাঁদেরকে ক্ষমা করা যেতে পারে না।

সত্যিকার ভারতীয়

আমার চিন্তা সর্বসাধারণের চিন্তা থেকে কিছুটা অগ্রবর্তী। তাই আমি যখন 'ভারতীয়' শব্দটি উচ্চারণ করি, তখন আমার কাছে তার সঠিক অর্থ হলো-কেবল ভারতীয় মুসলমানরাই ভারতীয়। তাই আমার মতে 'ভারতীয়'—এই শব্দের সাথে 'মুসলিম' শব্দটি জুড়ে দেয়ার তেমন একটা প্রয়োজন নেই। সত্যিকার অর্থে ভারতীয় হলেন তাঁরাই যাঁরা ভারতের বিশৃঙখলা, বিচ্ছিন্নতা ও অস্থিরতা দূর করে তাতে ঐক্য সৃষ্টি করেছেন এবং দেশকে সঠিক পথে এনে দিয়েছেন। এই দৃষ্টিভংগি নিয়ে ভারতের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, এখানে প্রথমত ভেল এবং গুণ্ড সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করতো। তাদের ইতিহাস আমাদের জানা নেই। আমরা এখন এতটুকু জানি যে, ভারতে আর্যরাই প্রথমত মোটামুটি একটা ঐক্য এনেছিলেন এবং মহান অশোকের ন্যায় এমন একজন সম্রাট সৃষ্টি করেছিলেন, যিনি প্রায় গোটা ভারতে একটা কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙখলা দূর করেছিলেন। আর্যরাই প্রথম ভারতীয়, যাঁরা ভেল ও গুণ্ডদের ভারতীয়ত্ব বিলীন করে দেন (যদি তাঁরা আদৌ এখানে কোন ভারতীয়ত্ব সৃষ্টি করে থাকেন)।

এরপর ইসলাম তার প্রথম যুগেই ভারত-সীমান্তে উপনীত হয়। কাবুল এবং গযনী, যেই অঞ্চলকে ইতিহাসে ভারতের প্রান্তিক অঞ্চল ধরা হয়, সেই এলাকাটি হযরত উসমানের খিলাফতের যুগে বিজিত হয়। তবে একটি নতুন আন্দোলনরূপে ইসলাম চার শ' বছর পরেই ভারতে প্রবেশ করে।

বর্তমান ভারতে আর্যদের মর্যাদা

গযনী কেন্দ্র থেকে মাহমুদ অগ্রসর হন এবং মুসলমানরা পাঁচ-ছয়শ বছরের মধ্যে ভারতের বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলোকে নতুনভাবে গ্রথিত করেন। অশোকের পর ভারতে আবার আলমগীরের ন্যায় ভারত বিজয়ী বাদশা পয়দা হন, যিনি পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত সারা দেশ শাসন করেন এবং গোটা দেশে একক কানুন প্রচলন করে দেখিয়েছেন। এটা ছিল দ্বিতীয় শক্তি, যা আর্যদের ভারতীয়ত্বকে এমনভাবে নিশ্চিন্ন করে দেয়, যেমনটা আর্যগণ ভেল ও গুপ্তদের ভারতীয়ত্বকে করেছিলেন। কিন্তু আর্যদের পতন এমন ছিল না, যেমনটা ছিল গুপ্ত ও ভেলদের। তাই এটা বলাই অধিকতর সমীচীন হবে যে, মুসলমানরাই প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় এবং হিন্দু তথা আর্যরা হলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর ভারতীয়।

আলমগীরের পরে ভারতে আবার বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। এই অস্থিরতা ও অরাজকতাকে বৃটিশরা এসে দূর করলেন। এখন যদি বৃটিশরা নিজেদেরকে ভারতীয় বলতে রাযী হন এবং তাঁদের একটি শাখা তথা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ন্যায় ভারতকে নিজেদের দেশ করে নেন এবং তাঁরা ঐ ঐক্যের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হন, তবে আজ তাঁদেরকেই প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় বলা যাবে এবং মুসলমান ও হিন্দুদেরকে বলা হবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ভারতীয়। কিন্তু এখনো বৃটিশ শক্তি ভারতীয়ত্ব গ্রহণে প্রস্তুত নন। এজন্য বর্তমানে মুসলমানদেরকেই প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় বলে পরিগণিত করা যেতে পারে।

শাসন ক্ষমতা এবং সংখ্যালঘিষ্ঠতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা

তাই মুসলমানরা যখন বলেন-"ভারত আমাদের", তখন বড় একটি সত্যের প্রতিধ্বনি হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন আমাদের নব্য ও পুরনো শিক্ষিত লোকদের মধ্যে সেই সব বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা নেই। তাঁরা আদমশুমারীর গোলক-ধাঁধায় পতিত রয়েছেন। ভারতীয়রূপে তাঁদের যেসব অধিকার রয়েছে, সেগুলো অর্জন করার চেষ্টা তাঁরা করছেন না। যেসব মুসলমান নিজেদের সংখ্যার ফিকিরে রয়েছেন, তাঁদের ভেবে দেখা উচিত, ইংরেজরা কি তাঁদের সংখ্যাধিক্যের বদৌলতে ভারত শাসন করছেন? সত্য কথা হলো—সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যাস্বল্পতার উপর

শাসন নির্ভর করে না, বরং তা নির্ভর করে সঠিক চিন্তাধারার উপর। যে সম্প্রদায়ের কাছে মানবতার উন্নতির জন্য সঠিক চিন্তাধারা থাকে এবং তাদের সাংগঠনিক শক্তি পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও দৃঢ় হয়, তাঁরাই সঠিকভাবে দেশ শাসন করতে পারেন। এই যোগ্যতা এখন ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যতটুকু রয়েছে, তা হিন্দুদের মধ্যে নেই। মানবতার সঠিক চিন্তা মুসলমানকে কয়েক ঘন্টায় শেখানো যায়। কিন্তু এই চিন্তা বোঝার মত লোক হিন্দুদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। সাধারণ হিন্দু সমাজ এই যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁদেরকে এই সঠিক চিন্তা শেখানো যাবে না। তা শিখতে হলে তাঁদেরকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে।

সঠিক চিন্তাধারার যোগ্য কারা ?

শাসন ক্ষমতা পরিচালনার জন্য সঠিক চিন্তাধারার প্রয়োজন রয়েছে। মুসলমানরা এখনো সেই সাংগঠনিক চিন্তার পথ ভুলেন নি। তাঁরা নিজেদের প্রশাসনিক দক্ষতার পাশাপাশি ইউরোপীয় অস্ত্রের ব্যবহারও শিখে ফেলেছেন। এজন্য বর্তমান যুগে ঐ সঠিক চিন্তাধারা কাজে লাগাবার সর্বোৎকৃষ্ট সুযোগ তাঁদেরই রয়েছে। বলা যেতে পারে, হিন্দুরাও তো ইউরোপীয় জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করে নিজেদের সমাজকে অগ্রবর্তী করে নিচ্ছেন। বর্তমান ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। এটা সত্য যে, হিন্দুরাও ইউরোপীয় শাসন পদ্ধতি কতকটা আয়ত্ত করে নিয়েছেন। কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে বলছি যে, মুসলমানদের কাছে যে কর্মদর্শন রয়েছে, আর যার বদৌলতে তাঁরা বিশ্বের জাতিপুঞ্জের নেতৃত্ব অর্জন করতে পারেন, ঐ কর্মদর্শন হিন্দুদের কাছে নেই। এর সামান্য উদাহরণ হলো- কংগ্রেস ইউরোপীয় চিন্তাধারারই ফসল এবং সেই আবহাওয়াতেই তা অগ্রসরতা লাভ করেছে। যতদিন তাতে ঐ ইউরোপীয় চিন্তাধাবিদদের সংযোগ ছিল, ততদিন সেই প্রতিষ্ঠানে প্রতিক্রিয়াশীলতা খুব কমই স্থান লাভ করেছে। কিন্তু যেদিন তাঁদেরকে (কংগ্রেসীদেরকে) সামান্য প্রশাসনিক দায়িত্ব দেয়া হলো, সে দিনই তাঁদের উপর সব ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলতা এসে সওয়ার হলো। কংগ্রেসীরা কি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শাসন পরিচালনা করতে পেরেছিলেন? এর উত্তর নাবোধক ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুত পুঁজিবাদী ক্ষমতাকে রাযী করানো ছাড়া হিন্দুদের আর কোন লক্ষ্যবস্তু নেই।

পুঁজিবাদ ও হিন্দু

হিন্দুরা যখন নতুন কোন পদ্ধতি সৃষ্টি করেন, তার ভিত্তি স্থাপিত হয় পুঁজিবাদের উপর। গান্ধীর মত মানুষও মানবতার এত বড় পূজারী হয়ে পুঁজিবাদ থেকে এক ইঞ্চিও হটতে পারেন নি। এমনিভাবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কম্যুনিস্ট হয়েও পুঁজিবাদী রয়ে গেলেন। অন্যদিকে হাসরত মোহানীকে দেখুন। যে দিন তিনি সমাজবাদ গ্রহণ করলেন, সে দিনই তাঁর সমস্ত সম্পদ-সম্পত্তি নিঃশেষ করে দিলেন। তিনি এখন এক কড়িরও মালিক নন। জওহরলাল নেহরু ইউরোপ গিয়ে সোশ্যালিস্টদের সাথে থেকে সমাজবাদ শিখলেন। কিন্তু হাসরত নিজ চিন্তার উপর ভর করেই ঐ মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন। এটাই হলো হিন্দু সমাজ ও মুসলিম সমাজের মধ্যে পার্থক্য। মুসলমানরা যে দিন নিজেদের শাসন পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন, সে দিন তাঁরা পুঁজিবাদের মূর্তি ভেংগে দেবেন। আজ পৃথিবীতে পুঁজিবাদের চাইতে বড় আর কোন্ মূর্তিটা রয়েছে, যেটা ভাংগার প্রয়োজন আছে।

মুসলমান পুঁজিবাদের দুশমন

মুসলমানরা হলেন ভারতীয় এবং তাঁরা পুঁজিবাদের দুশমন। তাঁরা যে কোন অপুঁজিবাদী অমুসলমানের প্রতিও মানবতা প্রদর্শন করতে জানেন। এখনো ভারতে এমন সব ওলীআল্লাহ্‌র মাযারগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা করা হচ্ছে, যাঁরা মানবতার সেবা করে গেছেন।

আল্লাহ্‌র শুক্‌রিয়া! মুসলমান নওজোয়ানরা কুরআন-এ-হাকীমের প্রতি পুরোপুরি দৃষ্টি দিয়েছেন। কুরআনের শিক্ষা বর্তমান পুঁজিবাদ সমর্থন করে না। মুসলমান নওজোয়ানদেরকে আর বেশী দিন ব্যবস্থাপক সভার পুঁজিবাদী সদস্যদের তাবেদার করে রাখা যাবে না। এর মানে হলো—ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ভবিষ্যত সামলাবার মত পুরো যোগ্যতা ও ক্ষমতা রয়েছে। বৃটিশ শাসনামলে তাঁরাই ভারতের বিশৃঙ্খলা দূর করে ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে পারেন। তাই পূর্বের ন্যায় ভবিষ্যতেও সত্যিকার অর্থে তাঁদেরকেই ভারতীয় বলা যাবে।

একজন ভারতবাসীর করণীয়

এসব আলোচনার সারকথা হলো—মুসলমানদের উচিত-ভারতীয় মুসলমান বাদশা আলমগীরের চিন্তাধারাকে ভুলে না যাওয়া। কিন্তু আলমগীরের সাম্রাজ্যবাদকে নিজেদের লক্ষ্যবস্তু গণ্য করা ঠিক হবে না। তবে তাঁর আমলে শাহ্ ওলীউল্লাহ্ দেহলবীর পিতা ও চাচা ইসলামী দর্শনের যে উন্নতি সাধন করেন এবং শাহ্ সাহেব মুহাম্মদ শাহের আমলে যে দর্শন সংকলন করেন, সেটাকে আলমগীরের রেখে যাওয়া সম্পদ বলে মনে করতে হবে। পরিষ্কার ভাষায় বলতে গেলে, বহির্দেশীয় মুসলমানদের হতবুদ্ধিসুলভ কর্মসূচীতে নিজেদের জড়ানো ভারতীয় মুসলমানদের উচিত নয়। তাঁদের উচিত হলো, নিজ ঘরের উপর কব্জা জমানোর জন্য অবিরাম চেষ্টা করা। যদি এই কাজে এক শ' বছরও লেগে যায়, তবু তাঁদের কর্মসূচী পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই।[১]

১. খুতুবাত ১৯৫-২০৩

পরিশিষ্ট চার

(উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী রচিত 'শাহ্ ওলীউল্লাহ্ আওর উন্‌কা ফাল্‌সাফা' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে কিছুটা অংশের অনুবাদ)

ইসলাম ও ভারতীয়ত্ব

ভারতের বাইরে ইসলামী দেশ ভ্রমণ ও তথায় অবস্থানকালে আমি দেখেছি যে, একজন আরব যেমন মুসলমানরূপে গর্ব অনুভব করে, তেমনি সে আরবরূপেও দর্প বোধ করে থাকে। ইরানী এবং তুর্কীরাও তাই করে। কিন্তু একজন ভারতীয় মুসলমান যখন অন্য মুসলিম দেশে যায়, তখন সে নিজ ভারতীয়ত্বের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে আরম্ভ করে। আমার মতে, এর কারণ হলো এই যে, তাঁর ধারণায় ভারতীয়ত্ব ও ইসলাম দু'টি পৃথক পৃথক বস্তু। তাই সে যখন নিজেকে মুসলমানরূপে পরিগণিত করে, তখন সে তার মন থেকে ভারতীয়ত্বকে ঝেড়ে ফেলার প্রয়োজন বোধ করে। এর কারণ উপলব্ধি করা বেশী দুষ্কর নয়। ব্যাপারটা হলো-সাধারণত আমাদের দেশের মুসলমানরা বহির্ভারতের আলিম ও ইমামদের কিতাব ও তাঁদের শিক্ষা থেকে ইসলাম শিখে থাকে। এর অনিবার্য ফল হলো--তাদের মনে, জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠে যে, ইসলাম এবং ইসলামী শিক্ষার সব কেন্দ্রই ভারতের বাইরে অবস্থিত।

আমার মতে, ভারতীয় মুসলমানদের এই মনোভাব খুবই ক্ষতিকর। মনে রাখতে হবে, ভারতে মুসলমানের সংখ্যা যত বেশী, তত বেশী আর কোন দেশেই নেই। এ ছাড়া ভারতীয় মুসলমানদের উন্নতির জন্য ভারতে যতটুকু সম্ভাবনা ও সুবিধা রয়েছে, বহির্ভারতীয় মুসলমানদের জন্য তাদের দেশে ততটুকু নেই। তাই ভারতীয় মুসলমানদেরকে নিজ দেশের উপর আস্থা স্থাপন করতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত আমরা বহুকাল থেকে একটা ভুল

ধারণায় পড়ে আছি এবং আমরা ইসলাম ও ভারতীয়ত্বকে পরস্পরবিরোধী বলে মনে করেছি। এ জন্যই ভারতীয় মুসলমানদের এতবড় একটি সম্প্রদায় উন্নতির পথ থেকে আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

আমার মতে, ভারতীয় মুসলমানদের এই রোগের প্রতিকার হলো- তাদেরকে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা অর্জনের জন্য ভারতীয় ইমামদের উপর আস্থা স্থাপন করতে হবে। ভারতীয় ইমামদের মাধ্যমে যখন তাদের মন-মুকুরে ইসলামের নকশা অংকিত হবে, তখন তাদের অন্তরে যেমন ইসলামের ইজ্জত বাড়বে, তেমনি ঐ ভারতীয় ইমামদের শ্রেষ্ঠত্বও তাদের কাছে বৃদ্ধি পাবে। এর সাথে সাথে তাদের দৃষ্টিতে ভারতীয়ত্বের মর্যাদাও ভেসে উঠবে। তখন তারা ভারতীয়ত্বকে সম্মানের বস্তু বলে মনে করতে আরম্ভ করবে। এই মনোভাব জাগ্রত হলে একজন ভারতীয় মুসলমান সর্বপ্রথম নিজ দেশে থেকেই উন্নতি করার কথা চিন্তা করবে। নিজ বাহুবলে উন্নতি করাই হবে তার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কর্তব্য। এর পরে আসবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে মিলেমিশে উন্নতি করার প্রশ্ন। আমার ধারণায় বর্তমানে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য এটাই নিস্তারের একমাত্র পথ।

এটারই এখন আমাদের সবচাইতে বড় প্রয়োজন এবং এটাই হলো ভারতীয় মুসলমানদের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। এজন্যই আমি শাহ্ ওলীউল্লাহ্র ব্যক্তিত্বের উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করছি এবং ভারতীয়-দের মধ্যে তাঁর দেয়া জ্ঞান বিতরণের এত বেশী চেষ্টা করছি। আমার কাছে ভারতীয়ত্ব নিশ্চয়ই একটা সম্মানের বস্তু। আমি আমার ভারতীয়ত্বের জন্য সত্যিই গর্ব অনুভব করছি। কিন্তু আমার এই ভারতীয়ত্বের অর্থ হলো---আমি একাধারে ভারতীয় ও মুসলমান। এই ইসলাম আমি শাহ্ ওলীউল্লাহ্র নিকটেই শিখেছি, যিনি ছিলেন ভারতীয় ও দিহ্লবী। তিনি এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন, আর এখানেই সমাহিত হয়েছেন। তাই আজ আমার কাছে ইসলাম ও ভারতীয়ত্ব দু'টি পৃথক বস্তু নয়। বরং আমি শাহ্ ওলীউল্লাহ্র শিক্ষার বদৌলতে ভারতীয়ত্বকে ইসলামের মধ্যেই ঢুকিয়ে দিয়েছি। এখন আমি মুসলমান বলে যতটুকু দর্প করছি, ভারতীয় বলেও তদ্রূপ গৌরব অনুভব করছি।[১]

১. উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, 'শাহ্ ওলীউল্লাহ্ আওর উন্‌কা ফালসাফা' সিন্ধ্ সাগর একাডেমী, লাহোর, ১৯৪৪; পৃঃ ২১২-২১৫

পরিশিষ্ট পাঁচ

(উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী রচিত 'শাহ্ ওলীউল্লাহ্ আওর উন্কা ফাল্সাফা' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে কিছুটা অংশের অনুবাদ)

ব্যক্তিসত্তা ও সমষ্টিসত্তা

দুর্ভাগ্যবশত দীর্ঘকাল যাবত আমাদের বিদ্বৎজনেরা ইতিহাসকে ব্যষ্টিগত দৃষ্টিকোণ্ থেকে দেখে আসছেন। এই রোগটি আমাদের এখানে স্বেচ্ছাচারী বাদশাদের যুগেরই একটা জের। স্বৈরাচারের অনিবার্য ফল এই দাঁড়ায় যে, সেখানে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সমষ্টি-সত্তার স্থলে ব্যক্তি-সত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়; গুটিকতক ব্যক্তির চেষ্টাকেই ইতিহাসের উত্থান-পতন এবং কালের ভাংগা-গড়ার কারণ বলে বর্ণনা করা হয়; কিন্তু এর পেছনে সমষ্টি-সত্তার যে কার্যকলাপ রয়েছে, তা তুলে ধরা হয় না। এ জন্যেই আমাদের ইতিহাস-গ্রন্থসমূহ জাতির সমষ্টিগত জীবন ও তার উত্থান-পতনের ইতিহাস না হয়ে তা কেবল বাদশা ও খ্যাতি-মান ব্যক্তিদের ইতিবৃত্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা হলো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদেরই গতি-প্রকৃতি। এরই ফলে আমাদের বিদ্বৎজনেরা ইসলামের সমষ্টিগত শক্তিকে উপেক্ষা করে চলেছেন। তাঁদের কলমের সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত হয় ব্যক্তিত্বসমূহের বিশ্লেষণে। জাতীয় জীবন ও জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে সমাজ-জীবনের যে গুরুত্ব রয়েছে, আমাদের বুদ্ধিজীবীরা তা বর্ণনা করার প্রয়োজন বোধ করেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাঁরা যখন রসূল করীমের জীবনী লিখতে বসেন, তখন মক্কার সামাজিক জীবন এবং কুরাইশ সম্প্রদায়ের শাসন-শৃঙ্খলা, যার সাথে রসূল করীমের নবুয়ত এবং তাঁর মিশনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে, সেগুলোর পটভূমি সামনে রাখা হয় না। তাঁরা কেবল রসূল করীমের নবুয়ত ও রিসালতের উপর গভীরভাবে দৃষ্টিপাত

করেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি গোটা মনুষ্য জাতির মধ্যে একজন পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও উচ্চতর মানুষ সৃষ্টি করবেন। সেই অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব হলেন রসূল করীম। প্রত্যেক আলিমের লক্ষ্যবস্তু হলো—তিনি তাঁর জ্ঞান ও বিশেষ চিন্তা খাটিয়ে রসূল করীমের জীবনী লিখবেন। তাই আমাদের এখানে এই পদ্ধতির অনেক বেশী জীবনী-গ্রন্থ রচিত হয়ে আসছে।

আমি যখন সরাসরি ইউরোপীয় রাজনীতি অধ্যয়ন করতে লাগলাম, তখন সেখানকার পুঁজিবাদ উদ্ভূত সমষ্টিগত জীবনকে দেখা ও বোঝার পুরোপুরি সুযোগ আমার হয়েছিল। আমি দেখলাম, সেখানকার সমষ্টিগত জীবনটা শ্রমিকরাই সৃষ্টি করছে। আরো লক্ষ্য করলাম, পুঁজিবাদী সমাজ এবং সাম্যবাদী সমাজ—উভয়ের নেতারাই ধর্মবিরোধী। পার্থক্য হলো—সাম্যবাদীরা মনের কথা গোপন রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন না। তাঁরা প্রকাশ্যে ধর্মের উপর হামলা করেন। পুঁজিবাদীরা আসলে ধর্ম-বিরোধিতার বেলায় সমাজবাদীদেরই সমদর্শী। কিন্তু তাঁরা প্রকাশ্যে তা প্রচার করেন না। সত্যি কথা বলতে গেলে, এঁরা নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধার জন্য ধর্মকে এবং ধর্মীয় লোকদেরকে ব্যবহার করে থাকেন। এ জন্যই এঁরা প্রকাশ্যে ধর্মের বিরোধিতা করে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের শত্রুতা খরিদ করতে চান না।

পুঁজিবাদীরা যে ধর্মের বিরোধিতা করেন না—তার মানে এই নয় যে, তাঁরা ধর্মের মংগল কামনা করেন এবং মনে প্রাণে এর বিরোধী নন। পক্ষান্তরে শ্রমিক শ্রেণী যে সমাজ সৃষ্টি করছেন, সেই সমষ্টিগত আন্দোলনের সাথে ধর্মহীনতার কোন স্বাভাবিক সম্পর্ক আমি প্রত্যক্ষ করি নি। আমার মনে হয়, শ্রমিক শ্রেণীর এই আন্দোলন ও ধর্মহীনতা-পরস্পর অবিচ্ছেদ্য নয়। অর্থাৎ মানবেতর লোক ও শ্রমিক শ্রেণী যদি কোন সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করে, তবে তা ধর্মহীন ও ধর্মবিরোধী হবেই—এমন কথা বলা যাবে না। মোটকথা, আমি জাতীয় জীবনে ব্যষ্টির স্থলে সামাজিক জীবনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করি। আমি শাহ্ সাহেবের গ্রন্থসমূহে দেখেছি যে, তিনিও ব্যক্তি-সত্তার চাইতে সমষ্টি-সত্তার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমি ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু পড়েছি, তা দেওবন্দেই পড়েছি। সারা দুনিয়া জানে, দেওবন্দ স্কুল শাহ ওলীউল্লাহ্র রাজনৈতিক

চিন্তাধারার উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেওবন্দের শিক্ষা, ইউরোপীয় রাজনীতির অধ্যয়ন এবং শাহ ওলীউল্লাহর চিন্তাধারা—এ সব বস্তুই আমার মধ্যে ইতিহাসের ঘটনাবলীকে সামাজিক দৃষ্টিভংগি নিয়ে দেখার স্বভাব গড়ে তুলেছে। আমি স্পষ্ট ভাষায় এটা বলে দিতে চাই যে, আমার মতে সমাজবাদ হলেই সেখানে ধর্মহীনতা থাকবে—এটা বলা চলবে না।

এতে সন্দেহ নেই যে, শাহ ওলীউল্লাহ ব্যক্তিত্বের তুলনায় সমাজবাদিতার দিকটা তত বেশী তুলে ধরেন নি। তাঁর সময়ে দেশের যে অবস্থা ছিল, তাতে এ ধরনের চিন্তাধারা খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করার অধিকার তাঁর ছিল না। এখন সময়ের পরিবর্তন হয়েছে; বাদশাদের যুগ কবেই অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন আমরা বাদশা-পূজার যুগ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। এই সময় ও এই পরিস্থিতিতে আমার কি করা প্রয়োজন এবং কি কারণে আমিও শাহ ওলীউল্লাহর ন্যায় ইসলামের সমষ্টিগত দিকটা এখনো খোলামেলাভাবে বলতে ইতস্তত করছি, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ বিষয়টি প্রকাশ্যে বলতে গেলে আমার সবচাইতে বেশী যে ক্ষতিটা হওয়ার আশংকা রয়েছে, তা হলো—আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যাঁরা শাহ ওলীউল্লাহর দর্শন গভীরভাবে পড়েন নি, তাঁরা আমার বিরোধিতা করতে উদ্যত হবেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমাদের এই শ্রেণীটি এখন বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এখন এই দুর্বল শক্তির পরোয়া করা এবং তাঁদের সর্বনাশ হতে পারে, এই ভয়ে নিজ কথা না বলা হবে অর্থহীন। শাহ সাহেবের সময় ঐ মুসলমান শ্রেণীর কিছুটা শক্তি ছিল। সেটা টিকিয়ে রাখার জন্য শাহ সাহেব যদি সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু করে থাকেন, তবে ঠিকই করেছেন। কিন্তু দু'-শ' বছর পার হয়ে যাওয়ার পর এখন সব কিছুই হারিয়ে গেছে। বর্তমানে এমন কিছু অবশিষ্ট রয় নি, যা রক্ষা করার জন্য সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখার কথা মনে উদিত হতে পারে। এ জন্যেই এবং এই পরিস্থিতিতে আমার সংকল্প হলো—আমি শাহ ওলীউল্লাহর প্রকৃত শিক্ষা প্রকাশ্যে গোটা মানব জাতির সামনে তুলে ধরবো।[১]

১. উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, শাহ্ ওলীউল্লাহ্ আওর উন্‌কা ফাল্‌সাফা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫১-১৫৫

পরিশিষ্ট ছয়

(১৯১৮ সালে প্রকাশিত উবায়দুল্লাহ সিন্ধী সংক্রান্ত রাউলাট-
সিডিশন কমিটির রিপোর্ট থেকে কিছুটা অংশের উদ্ধৃতি)

"The SilK Letter" Conspirators

In August 1916 the plot known to Government as the "Silk Letters" case was discovered. This was a project hatched in India with the object of destroying British rule by means of an attack on the North-West Frontier, supplemented by a Muhammadan rising in this country. For the purpose of instigating and executing this plan a certain Maulvi Obeidullah crossed the North-West Frontier early in August 1915 with three companions, Abdullah, Fateh Muhammad and Muhammad Ali. Obeidullah is a converted Sikh and had been trained as a Maulvi in the Muslim religious school at Deoband in the Saharanpur district of the United Provinces. There he infected some of the staff and students with his own militant and anti-British ideas, and the principal person whom he influenced was Maulana Mahmud Hassan, who had long been head Maulvi in the school. Obeidullah wished to spread over India a pan-Islamic and anti-British movement through the agency of Maulvis trained in the famous Deoband school. But his plans were thwarted by the Manager and Committee, who dismissed him and some of his chief associates. There is evidence too that he got into trouble over some accounts. Maulana Mahmud Hassan, however, remained and continued to receive visits from Obeidullah. Secret meetings were held at the Maulana's house and it was reported that men from the frontier had been received there. On September the 18th, 1915, Mahmud Hassan, with a

certain Muhammad Mian Ansari and other friends, followed Obeidulla's example by leaving India, not however for the North, but for the Hedjaz tract of Arabia.

Before departing, Obeidullah had started a school in Delhi, and had put two books into circulation preaching militant fanaticism to Indian Muhammadans and impressing on them the supreme duty of jihad. The common object of this man and his friends, including the Maulana was to promote a great Muslim attack on India which should synchronize with a Muslim rebellion. We shall see how each endeavoured to accomplish his purpose.

Obeidullah and his friends first visited the Hindustani fanatics and afterwards proceeded to Kabul. There he met the members of a Turco-German Mission with whom he fraternised ; and after some time he was joined by his Deoband friend, Maulvi Muhammad Mian Ansari. This man had accompanied Maulana Mahmud Hassan to Arabia and returned in 1916 with a declaration of jihad received by the Maulana from the hand of Ghalib Pasha, then Turkish Military Governor of the Hedjaz. While on his way, Muhammad Mian distributed copies of this document, known as the "Ghalib-nama" both in India and among the frontier tribes. Obeidulla and his fellow-conspirators had devised a scheme for the provisional government of India after the overthrow of British power. A certain Mahendra Pratap was to be President. This man is a Hindu of good family and eccentric character, who, at the end of 1914, was granted a passport to travel in Italy, Switzerland and France. He had gone straight to Geneva, had there met the notorious Hardayal and had been by Hardayal introduced to the German Consul. He had then proceeded to Berlin and had thence been despatched on a special mission, having apparently impressed the Germans with an exaggerated idea of his importance.

Obeidullah himself was to be Minister of India, and Barkatulla, a friend of Krishnavarma's and a member of the American Ghadr party, who had also travelled to Kabul via Berlin, was to be Prime Minister. Son of a servant of the Bhopal State, he had visited England,

America and Japan. He had been appointed Professor of Hindustani at Tokio. He had there edited a bitter anti-British paper called "The Islamic fraternity," which was suppressed by the Japanese authorities. He had later been dismissed from his appointment and had then joined his Ghadr friends in America.

The Germans of the Mission, failing to achieve their object left Afghanistan early in 1916 ; but the Indians remained, and the 'Provisional Government' despatched letters to both the Governor of Russian Turkestan and the then Czar of Russia inviting Russia to throw over her alliance with Great Britain and assist in the overthrow of British rule in India. These were signed by Mahendra Pratap and subsequently fell into British hands : The letter to the Czar was on a gold plate, a photograph of which has been shown to us.

The "Provisional Government" also proposed to form an alliance with the Turkish Government, and in order to accomplish this object Obeidulla addressed a letter to his old friend, Maulana Mahmud Hassan. This together with another letter dated the 8th Ramzan (9th July 1916), written by Muhammad Mian Ansari, he forwarded under a covering note addressed to Sheikh Abdur Rahim of Hyderabad, Sind, a person who has since absconded. Sheikh Abdur Rahim was requested in the note to send on the enclosures by the hand of some reliable hadji (pilgrim) to Mahmud Hassan at Mecca, or even to convey them himself if no trustworthy messenger were obtainable. We have ourselves seen the letters to Mahmud Hassan which came into British hands. They are neatly and clearly written on yellow silk. Muhammad Mian's letter mentioned the previous arrival of the German and Turkish missions, the return of the Germans, the staying on of the Turks," "but without work," the runaway students, the circulation of the 'Ghalibnama," the "Provisional Government," and the projected formation of an 'army of God." This army was to draw recruits from India and to bring about an alliance among Islamic rulers. Mahmud Hassan was to convey all these particulars to the Ottoman Government. Obeidulla's letter contained a tabular statement

of the 'army of God." Its headquarters were to be at Medina and Mahmud Hassan himself was to be general-in-chief. Secondary headquarters under local generals were to be established at Constantinople, Tehran and Kabul. The general at Kabul would be Obeidulla himself. The table contains the names of three patrons, 12 field marshals, and many other high military officers. Of the Lahore students, one was to be a major-general, one a colonel, and six lieutenant-colonels. Most of the persons designated for these high commands cannot have been consulted as to their appointments. But the whole information conveyed by the silk letters has rendered certain precautions advisable, and these have been taken.

In December 1916 Maulana Mahmud Hassan and four of his companions fell into British hands. They are now prisoners of war interned in a British possession. Ghalib Pasha, the signer of the "Ghalibnama", is also a prisoner of war and has admitted signing a paper put before him by the Mahmud Hassan party. A translation of its prominent passages runs as follows : "The Muhammadans in Asia, Europe and Africa adorned themselves with all sorts of arms and rushed to join the jihad in the path of God. Thanks to Almighty God that the Turkish Army and the Mujahidin have overcome the enemies of Islam... Oh Moslems, therefore attack the tyrannical Christian government under whose bondage you are. Hasten to put all your efforts, with strong resolution, to strangle the enemy to death and show your hatred and enmity for them. It may also be known to you that Maulvi Mahmud Hassan Effendi (formerly at the Deoband Madrassa, India) came to us and sought our counsel. We agreed with him in this respect and gave him necessary instructions. You should trust him if he comes to you and help him with men, money and whatever he requires."[১]

---

১. Rowlatt Sedition Committee Report, 1918, Chapter XIV, Pp. 125-127

গ্রন্থপঞ্জী

যে সব গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে ঃ
(লেখকের নামের বর্ণানুক্রমে)

আনীস, সিদ্দিকী ঃ হতভাগ্য বাদশা আমানুল্লাহ॥
খুলনা ঃ তারিক সিদ্দিকী, ১৯৬৯

আবদুর রশীদ, আরশাদ ঃ বীস বড়ে মুসলমান॥
দেওবন্দ্ ঃ ১৯৭০

আবদুল্লাহ্, মুহাম্মদ, সৈয়দ (সম্পাদিত) ঃ দায়েরা-এ-মাআরিফ-এ-ইসলামিয়াহ্ (৯)॥
লাহোর ঃ পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, ১৯৭২

ইকরাম, এস. এম. ঃ মওজ-এ-কওসর॥
লাহোর ঃ ফীরোয সন্স, ১৯৬৮

ইসহাক ভাট্টী, মুহাম্মদ ঃ ফুকাহা-এ-হিন্দ্ (৫ম খণ্ড, ২য় ভাগ)॥
লাহোর ঃ ইদারা-এ-সাকাফাত-এ-ইসলামিয়াহ, ১৯৮১

উবায়দুল্লাহ্, সিন্ধী, মওলানা ঃ যাতী ডায়েরী॥
লাহোরঃ সিন্ধ্ সাগর একাডেমী, ১৯৪৪

ঃ শাহ্ ওলীউল্লাহ্ আওর উন্‌কা ফাল্‌সাফা॥
লাহোরঃ সিন্ধ সাগর একাডেমী, ১৯৪৪

ঃ শাহ্ ওলীউল্লাহ্ আওর উন্-কী সিয়াসী তাহ্‌রীক্॥
লাহোর ঃ সিন্ধ্ সাগর একাডেমী, ১৯৫২

ঃ মাহমূদিয়া উবায়দিয়াহ্॥
লাহোরঃ মাকতাবা-এ-বায়তুল্-হিক্‌মত, ১৯৪৫

ওহীদ, মুহাম্মদ, মীর্যা (সম্পাদিত) : দায়েরা-এ-মাআরিফ-এ-ইসলামিয়াহ্ : (২) ॥
লাহোরঃ পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, ১৯৬৬

তোফাইল আহমদ, সৈয়দ : মুসলমানু-কা-রওশন মুস্তাক্বিল্ ॥
বাদায়ুনঃ নিযামী প্রেস, ১৯৩৮

নুর-উদ্-দীন (অনুঃ) : শাহ্ ওলীউল্লাহ্ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ॥
ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪

বশীর আহমদ : শাহ্ ওলীউল্লাহ্ আওর্ উন্-কা-ফাল্-সাফা-এ-উম্‌রানিয়াত-ওয়া-মাআশিআত ॥
লাহোরঃ মাকতাবা-এ-বায়তুল হিকমত, ১৯৪৫

মুহাম্মদ মিঞা, সৈয়দ : উলামা-এ-হক্ (১) ॥
দিল্লী ঃ দিল্লী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৪৬

যিয়াউদ্‌দীন, বার্নী : আয্‌মত-এ-রাফ্‌তাহ্ ॥
করাচী ঃ তালীমী মারকায, ১৯৬১

সরওয়ার, মুহাম্মদ (সংকলিত) : খুতুবাত-এ-মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী ॥
লাহোরঃ সিন্ধ্ সাগর একাডেমী, তারিখ-বিহীন

: মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ॥
লাহোর ঃ সিন্ধ্ সাগর একাডেমী, ১৯৬৭

সাঈদ আহমদ, আকবরাবাদী : মওলানা উবায়দুল্লাহ্ আওর উন্-কে-নাকিদ্ ॥
লাহোর ঃ সিন্ধ্ সাগর একাডেমী, ১৯৪৬

হুসাইন আহমদ, মাদানী : নক্‌শ-এ-হায়াত (২) ॥
দেওবন্দ ঃ মাকতাবা-এ-দীনিয়াহ্, ১৯৫৩

: তাহ্‌রীক-এ-রেশ্‌মী রুমাল ॥
লাহোর ঃ ক্লাসিক, ১৯৬০

Adamec, Ludwig W. : Afghanistan (1900-1923) A Diplomatic History
California : University of California, 1967.

Aziz Ahmed : Islamic Modernism in India and The Birth of Pakistan.
London : Oxford University Press, 1967

Fraser Tytler, W.K. : Afghanistan : A Study of Political Developments in Central and Southern Asia.
London : Oxford University Press, New York Toronto, 1967

Griffiths, John C. : Afghanistan-Key to a Continent.
Colorado : Westview Press, Boulder Colorado, USA, 1982

Hafiz Malik : Moslem Nationalism in India and Pakistan.
Washington Public Affairs, 1963

Ishtiaq Husain, Qureshi : The Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent.
Hague : Mouton & Co., 1962

Jain, Naresh Kumer (ed.) : Muslims in India (II)
New Delhi : Manohar Publications, 1983

Perala, Ratnam : Afghanistan's Uncertain Future.
New Delhi : Tulsi Publishing Houses 1981

Sen, SP (ed.) : Dictionary of National Biography (III).
Calcutta : Institute of Historical Studies, 1974

Watkins, Mary Bradley : Afghanistan-Land in Transition. London : D. Van Nostrand Company Ltd., 1963

Wensinck, M. TH. Houtsma, A. J. (ed.) : Encyclopedia of Islam (III). London : Leiden, 1936

Ziaul Hasan, Faruqi : Deobond School and the Demand for Pakistan. Bombay : Asia Publishing House, 1963

নির্ঘণ্ট

[খ্যাতিমান ব্যক্তি, গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা, সভা-সম্মিলন, মিশন, পত্র-পত্রিকা, রিপোর্ট ও গ্রন্থের উল্লেখ কোথায় কোথায় রয়েছে]

ই

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	মুদ্রিত পাঠ	শুদ্ধ পাঠ
২৯	৮	একটি	এটি
৪৩	১১	ঐ	ও
৫৩	২৬	সতিকার	সত্যিকার
৬৯	১৯	কালে	কাবুলে
৭১	১২	মীসাক-এ-দিল্লী	মীসাক-এ- দিল্লী
৭১	২৮	যুগ্ন	মুগ্ধ
৭৩	১৪	সংখ্যানুপাত	সংখ্যানুপাতে
৭৭	২৫	প্রশ্বে	প্রশ্নে
৮০	১০	জমীঅতুল্-আবসার	জমীঅতুল্-আনসার

ইফাবা—৯১-৯২—প্র/৬১১৪ (উ)—১২৫০